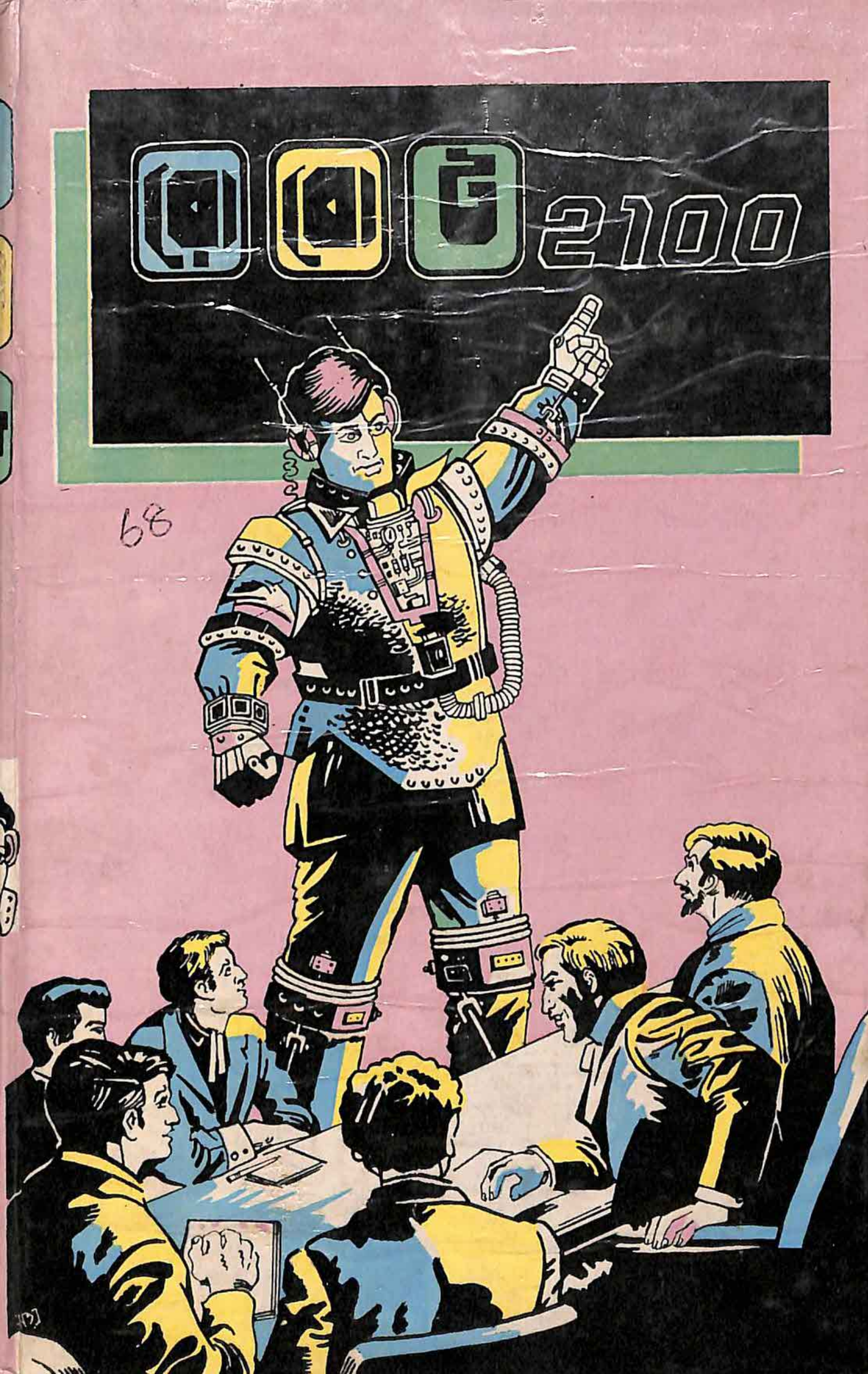
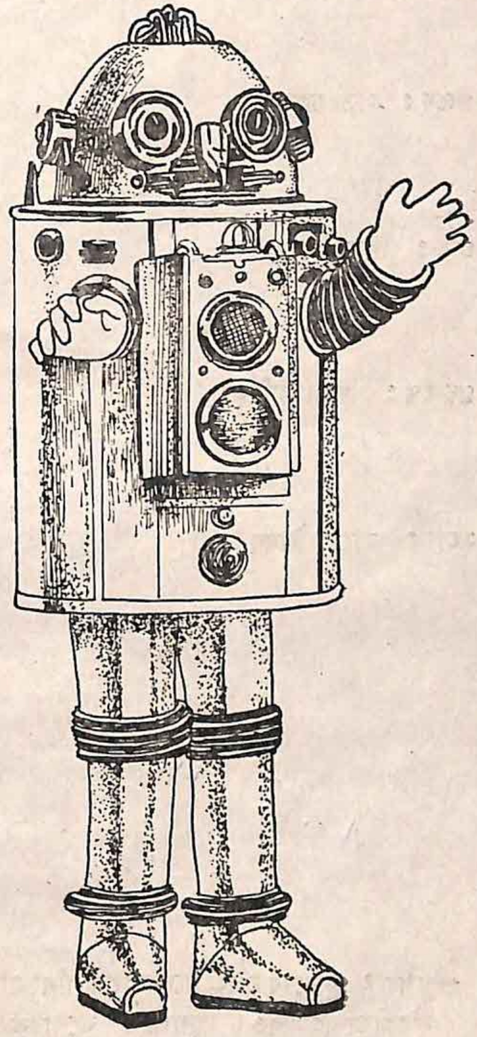

2100

রোবোট ২১০০



সলিল
লাহিড়ী

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১ (১৪ই মার্চ, ১৯৮৪)

প্রচ্ছদ ঃ সত্য চক্রবর্তী

ছবি ঃ শিবব্রত রায়

মূল্য ঃ বারো টাকা

প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ, মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। মুদ্রাকর ঃ অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

Robot 2100 : Science Fiction relating future Robot

Price : Rs. 12.00 (Twelve)

চুম্‌কি (সুমিতা)
ও
বুবু (সোমদেব)
স্নেহভাজনকে

সূচিপত্র ঃ

১। রোবোট যখন মানুষ হল ৯

২। সার্জেন রোবো-নবারুণ ২২

৩। রোবো-নবারুণের লিগ্যাল রাইট ৫২

৪। বায়োনিক নবারুণ ৭৩

৫। নবারুণের রোবো-নগরী ৮৬

রোবোট মানুষ হোলো

রোবো-সাইকলজিস্ট ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার ল্যাবোরেটরি থেকে উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডঃ ভার্গবের ঘরে প্রায় ছুটেই ঢুকে পড়লেন ডঃ জোয়ারদার।

ডঃ হরিরাম ভার্গব তখন মডেল অশোক ২১০০ নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। ধীর-স্থির প্রকৃতির ডঃ জোয়ারদারকে এত উত্তেজিত দেখে ডঃ ভার্গব বলে উঠলেন, ডঃ জোয়ারদার, এনিথিং রং ?

—স্যার, যা দেখছি, অসম্ভব ব্যাপার! আপনিই বলুন, রোবোটের ফাণ্ডামেণ্টাল থিয়োরি কি ?

—কেন, এ-তো সবাই জানে। এক নম্বর থিয়োরি, কোনও রোবোট কোনও মানুষের ক্ষতি করবে না। কিংবা তার কাজ বা অকাজের জন্য কোনও মানুষের ক্ষতিসাধন ঘটাবে না।

—ঠিকই বলেছেন স্যার। আর দুনম্বর থিয়োরি বলছে রোবোট মানুষের আদেশ যথাযথ পালন করবে। অবশ্য সেই আদেশ মানুষের পক্ষে যেন ক্ষতিকারক না হয়। সর্বশেষ, তিন নম্বর থিয়োরি বলছে, এক নম্বর ও দুই নম্বর থিয়োরিকে লঙ্ঘন না করে, রোবোট নিজেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে।

—কারেক্ট। এর মধ্যে গোলমালটা দেখলে কোথায় জোয়ারদার ?

—স্যার, আজ ২০৩০ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞান অনেকটা এগিয়েছে। তবুও রোবোটকে নিয়ে সমানেই আমাদের পরীক্ষা চলছে। আজ থেকে ৭০ বছর পর, অর্থাৎ ২১০০ খ্রীস্টাব্দে রোবোট কিরকম হবে সেই নিয়েই আমরা কাজ করছি। সে তো আপনারই গাইডেনসে। সেই রোবোটের ইলেকট্রনিক নার্ভ-সিস্টেমের চার্ট আপনার টেবিলের ওপরই আছে। আমাদের সেই ২১০০ খ্রীস্টাব্দের মডেলের নাম আপনিই তো দিয়েছেন অশোক ২১০০।

—রাইট। সত্তর বছর পর ২১০০ খ্রীস্টাব্দে আমাদের এই রোবোট অশোক—২১০০ আরও কত কাজের হবে সেটাই তো বার করতে চাইছি। মডেল অশোক ২১০০ ঠিক দেখতে হবে মানুষের মত। আজকে, ২০৩০ খ্রীস্টাব্দের এই রোবোটগুলো কতটা ভারী দেখছ ? আজকের রোবোটগুলো কিছুটা মানুষের মত হলেও এদের রোবোট বলে চিনতে একটুও ভুল হয় না।

—ডঃ ভার্গব, ভেবে দেখুন, আমরা চেষ্টা করছি রোবোট যাতে মানুষের মত হয় তাইতো ? কিন্তু তাতে লাভ কি ? মানুষ প্রথমে ধরতে পারবে না যে রোবোটটি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, সত্যিকারের মানুষ নয়। কিন্তু তাতে লাভ ?

—বাঃ, লাভ নেই? কলকারখানায়, বাড়িতে, অফিসে, মানুষের বদলে রোবোটরাই কাজ করবে। আর তা ছাড়া, এই ধর না কেন, আমরা এই যে গোপনীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থায় আছি, আমরা কি কখনও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি না? তখন অশোক ২১০০-র মত একটি রোবোট যদি পাশে থাকে, তখন মনে হবে, আমার পাশে যেন একটি মানুষ আছে।

—কিন্তু ডঃ ভার্গব অশোক-২১০০ কি আপনার নিঃসংগতা কাটাতে পারবে?

—নাঃ, তা পারবে না। হয়ত আপনার বহু বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জবাব দেবে, কিন্তু আপনার সংগী হতে হলে আপনার না শেখানো অনেক প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে, যা অশোক ২১০০-র ক্ষমতায় থাকবে না। প্রত্যেক রোবোটের একটি যন্ত্রক্রিয়ার সীমা আছে। তার স্মৃতি এক নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই বারবার ঘোরাফেরা করে। যন্ত্রের অনুভূতি নেই। তাই নতুন তথ্যে যন্ত্রের স্মৃতি ভরে ওঠে না।

—দ্যাটস্ রাইট। সেইজন্যই তো অশোক ২১০০-কে প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তির অধিকারী করে দিচ্ছি। এর ফলে, সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক কাজগুলোর সবকিছুই সেই স্মৃতিভাণ্ডারে পাওয়া যাবে। আর ঠিক সেই জন্যই অশোক ২১০০ অনেকটা মানুষের মতই হয়ে উঠবে।

—স্যার, ঠিক এখানেই আমার প্রব্লেম। রোবোটকে আমরা মানুষের মত দেখতে তৈরি করতে পারি। রোবোটকে প্রচণ্ড স্মৃতিভাণ্ডারের অধিকারী করতে পারি। কিন্তু মানুষের নার্ভব্যবস্থা পারিপার্শ্বিক সংবেদন থেকে যেমন আপনা-আপনি পুনর্জন্ম নেয়, নিখুঁত হয়ে ওঠে জীবনের নানান অভিজ্ঞতার ফলে, রোবোটের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। মানুষের মস্তিষ্কের কোষে জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, সংবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে নতুন নতুন স্মৃতিতে। মানুষের মস্তিষ্কে, এই যে অবিরত নতুন-নতুন স্মৃতিভাণ্ডার আপনা থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে, রোবোট অশোক ২১০০-র ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব?

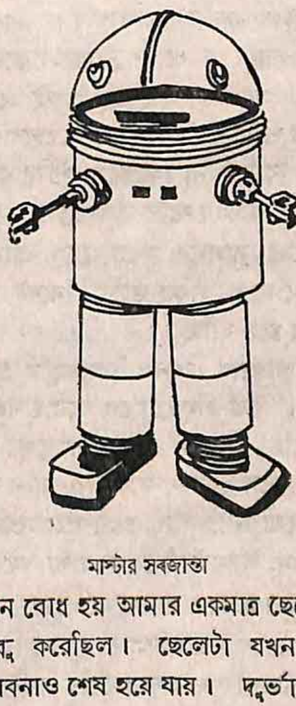
হেসে ওঠেন ডঃ ভার্গব। বলেন—ডঃ জোয়ারদার, ডোন্ট বি চাইলডিস্। ভুলে যেও না, রোবোট যতই আধুনিকতম হয়ে উঠুক, রোবোট যন্ত্রই। আর মানুষ মানুষই। রোবোট কোনদিনই মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে না। স্বয়ং বিকশিত ও স্বয়ং নিখুঁত হয়ে ওঠার ক্ষমতা রোবোটের কখনই হবে না।

—ডঃ ভার্গব গতকাল পর্যন্ত আপনার এই মতকে আমিও সমর্থন করতাম। কিন্তু আজ আমি আপনার সাথে একমত হোতে পারছি না।

—হোয়াট! বিস্মিত হয়ে ওঠেন ডঃ ভার্গব। —তুমি বলতে চাও স্বয়ংবিকশিত হয়ে উঠতে পারে—

—আমি সঠিক জানি না ডঃ ভার্গব, তবে রোবোটকে আমি জাস্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্র বলে আর ভাবতে পারছি না।

—কেন জোয়ারদার ! বিস্ময় ডঃ ভার্গবের গলায় ।
ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার তার প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট একটা কাঠের টুকরো বার করে ডঃ ভার্গবের হাতে দিলেন । ডঃ ভার্গব কাঠের টুকরোটা তুলে নিলেন ।
—বাঃ, ভারী সুন্দর কাজ তো কাঠের ওপর ! ডঃ জোয়ারদার, তুমি উড্‌গ্রেভিং-র কাজ জান নাকি ? ডঃ ভার্গবের গলায় বিস্ময় ।
—না স্যার, কাঠের ওপর এই সুন্দর খোদাই-এর কাজ আমার নয় । এটা কে করেছে জানেন ?
ডঃ ভার্গব বিস্মিত চোখে তাকালেন ডঃ জোয়ারদারের দিকে ।
ডঃ জোয়ারদার বললেন—একটু অপেক্ষা করুন স্যার, আমি আসছি । দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যান ডঃ জোয়ারদার ।
জোয়ারদারকে ডঃ ভার্গব বিশ্বস্ত সহকারী বলেই জানেন । ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনস্টিটিউট ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে আজ এই ২০৩০ খ্রীস্টাব্দে যে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে এসেছে তার জন্য এই সংস্থার ডাইরেক্টর ডঃ ভার্গব আর তার চীফ রোবো-সাইকলজিস্ট ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের অবদান কম নয় । ডঃ ভার্গব চিরকালই জানেন জোয়ারদার খুব কম কথার লোক । স্থির-নিশ্চিত না হলে কোনও কাজ করেন না, কোনও অবান্তর কথা বলেন না । তাই ডঃ জোয়ারদারের এই অস্থিরতা, এই অসংযত কথাবার্তা, ডঃ ভার্গবকে চিন্তিত করে তোলে ।
কিছুক্ষণের মধ্যেই ডঃ জোয়ারদার ফিরে আসেন । সংগে জোয়ারদারের সাথী মাস্টার সবজান্তা । ডঃ ভার্গব বিস্মিতভাবে তাকান ডঃ জোয়ারদারের দিকে । ডঃ জোয়ারদার বলেন, স্যার, আপনি মাস্টার সবজান্তাকে চেনেন বোধহয় ।
—হ্যাঁ, চিনি বৈকি । তোমার বাড়িতেই তো থাকে । মাস্টার সবজান্তা হচ্ছে তোমার পার্সোন্যাল রোবোট এসিস্টেণ্ট । এ ছাড়া, তোমার বাড়ির সব কাজকর্মও করে ।


মাস্টার সবজান্তা

—ঠিক বলেছেন স্যার । আপনি জানেন বোধ হয় আমার একমাত্র ছেলেটা মারা যাবার পর স্ত্রী ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করেছিল । ছেলেটা যখন হয় তখনই মিসেসের আর সন্তানাদি হবার সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায় । দুর্ভাগ্যের

ফলেই ছেলেটা যখন মারা গেল, তখন মিসেসের আপসেট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। শেষকালে তাই ইণ্ডিয়ান রোবোট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি থেকে আজ বিশ বছর হোল এই রোবোটকে কিনি। নাম দিলাম মাস্টার। ওর মেমারী স্টোরে ধীরে ধীরে নতুন নতুন কোড যোগ করতে লাগলাম। ক্রমেই দেখলাম মাস্টারের মেমারী স্টোরে প্রচণ্ড স্মৃতিভাণ্ডার তৈরি হয়েছে। আমার সমস্ত কাজেই ও সাহায্য করবার উপযোগী হয়ে উঠল। বাড়িতে আমার সংগী হিসেবে মাস্টার ক্রমে অপরিহার্য হয়ে উঠল। আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিত চটপট করে। তাই শেষকালে ওকে ডাকতে আরম্ভ করলাম—মাস্টার সবজান্তা বলে।

—আজ, তুমি পয়েন্টসের বাইরে চলে যাচ্ছ জোয়ারদার। আমার হাতের এই উড্-ক্রাফট্স্ কে করেছে সেটা তো বলবে। আমি তোমার রোবোট মাস্টার সবজান্তার অ্যাকটিভিটিস্ জানতে চাই না। ভুলে যাচ্ছ কেন, আজকে এই ২০৩০ খ্রীস্টাব্দে, প্রত্যেক বাড়িতেই রোবোট কাজ করছে। আমাদের এই শহরের সেনসাস্ রিপোর্ট যদি দেখ তবে দেখবে আমাদের এখানকার ৩৮ লক্ষ পপুলেশনের মধ্যে ১২ লক্ষ হচ্ছে রোবোট ওয়ারকার, আর ২৬ লক্ষ হচ্ছে মানুষ।

—এ কথা জানি ডঃ ভার্গব। কিন্তু আমি রোবোট মাস্টার সবজান্তার কথা কেন বলছি ধৈর্য ধরে শুনলেই বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম স্যার। মাস্টার সবজান্তা সবকিছু কাজই করে বাড়িতে। এই সবজান্তা বড় আদরের আমার স্ত্রীর কাছে। নিজের ছেলের মতই সবজান্তাকে আমার স্ত্রী দেখেন। আমি বাড়ি না থাকলে স্ত্রীর কাছে কাছেই থাকে সবজান্তা। আমি বুঝি সবজান্তা আমার স্ত্রীর কাজগুলো বড় বেশি চট্পট করে ফেলে। যাই হোক, আমাদের সংসারে সবজান্তাকে আনার পর স্ত্রীর কান্নাকাটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। সবজান্তাকে নিয়েই স্ত্রী তখন মশগুল। এ ভাবেই আমাদের সংসার চলে যাচ্ছিল।

—জোয়ারদার, এখনও কিন্তু তুমি তোমার পার্সোন্যাল অ্যাফেয়ার নিয়েই কথা বলছ। উড-ক্রাফট্টা কে করেছে বল নি।

—বলছি স্যার। মূল পয়েন্টে আমি প্রায় এসে গেছি। সবজান্তা আমার স্ত্রীর সংগে সর্বক্ষণ থাকলেও আমি যখন বাড়িতে ফিরে রিসার্চের কাগজ-পত্রগুলো নিয়ে বসি, তখন সবজান্তা আমার পাশেই থাকে। আমার ক্যাল-কুলেশন, অ্যানালিসিসে সাহায্য করে। এইভাবেই আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ গতকাল সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে কলিংবেল টিপতেই দেখি সব-জান্তা দরজা খুলে দিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর আমার স্ত্রী অনুপ্রভা এসেদরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি সবজান্তা চুপ করে ড্রইংরুমে বসে আছে।

—চুপ করে বসে আছে ? তোমার কলিং বেল শুনেও দরজা খুলে দিল না ?

—না, ডঃ ভার্গব। দ্যাট ওয়াজ সারপ্রাইজিং। সবজান্তার মেমারী সেলে এই পয়েন্টগুলো ডেফিনিটলি রাখা ছিল,যে কলিং বেল শুনলেই দরজা খুলবে, আমি বাড়িতে ফিরলেই আমাকে রিসিভ করবে। সবজান্তা এই কোডগুলো ফলো না করায় আমি বিস্মিত হলাম। আমি রেগে গিয়ে সবজান্তাকে ধমকালাম —কি ব্যাপার, বেল শুনেও দরজা খুলতে পারনি ? আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াতেও ভুলে গেছ।

আমার রাগ দেখে স্ত্রী সবজান্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। স্নেহের চোখে সবজান্তার দিকে তাকাল। অনুপ্রভা বললো—খোকাকে বোক না। ওর মন ভাল নেই।

—খোকা ! বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন ডঃ ভার্গব। —আপনার ছেলে তো বহুদিন আগেই মারা গেছে।

—অনুপ্রভা সবজান্তাকে ছেলের মতই স্নেহ করে। তাই ও সবজান্তাকে খোকা বলেই ডাকত। সত্যি বলতে কি, সবজান্তার মেটালিক বডিতে দিনে কতবার যে আদর করে হাত বোলাত বলার নয়। যেন সত্যি করেই ছেলেকে আদর করছে। কতদিন বলেছি অনুপ্রভাকে, ওসব পাগলামী কোর না। সবজান্তা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। তুমি যে আদর করছ তা কি সবজান্তা বুঝতে পারে ? না, পারে না। একটু থেমে দম নেয় ডঃ জোয়ারদার।

—বাঃ, ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো ! ডঃ ভার্গবের বিস্মিত স্বর ভেসে আসে।

অনুপ্রভার ছেলেমানুষী কথায় আমার রাগ বেড়ে যায়। দেখি সবজান্তা তখনও চুপচাপ বসে। আমি রেগে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বলি—কি হে, খুব যে চুপচাপ বসে আছ, বলি তোমার সিডিউলড্ ওয়ার্ক কে করবে ?

—মাকে তো আগেই বলেছি মনটা আমার ভাল নেই। আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। মেটালিক গলায় উত্তর দিল সবজান্তা।

—কি বললে ? চমকে ওঠেন ডঃ ভার্গব। রোবোট সবজান্তা বললো তার মনটা ভাল নেই ! কাজ করতে ইচ্ছে করছে না !

—ইয়েস ডঃ ভার্গব। আর তখন আমিও চমকে গেছি। রোবোটের মন বলে আবার কিছু থাকে নাকি ! দ্যে আর নাথিং বাট ইনস্ট্রুমেন্টস্ উইথ ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্টস্। তাই সবজান্তার কথা শুনে তাকালাম ওর দিকে। দেখি সবজান্তা তখনও চুপ করে বসে আছে। সবজান্তার ওরকম ইর‍্যাটিক ব্যবহার দেখে ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম—সবজান্তা, হঠাৎ তোমার মনটা ভাল নেই কেন শুনি ? কাজ করতে ইচ্ছে করছে না কেন ?

—দেখুন, আপনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। মা আমাকে ছেলের মত স্নেহ

করে। সবসময়ে কাছে কাছে রাখে। কিন্তু যখন আপনি কাজে বেরিয়ে যান, মা ঘুমিয়ে পড়ে, কিংবা বেড়াতে যায়, আমি তখন ভীষণ একলা হয়ে যাই। তখন আমি শুধু চুপচাপ বসে থাকি। বলুন, এতে কারুর ভাল লাগে? ভারী ভারী গলায় অনুযোগ করে সবজান্তা।

সবজান্তার কথা শুনে আমি বলি—ভুল করছ কেন সবজান্তা, তুমি তো মানুষ নও, তুমি শুধু রোবোট। তোমরা শুধু কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছো। যখন কাজ থাকবে না তখন চুপচাপ বসে থাকবেই তো।

—বাঃ, বেশ কথা বললেন। উত্তর দেয় সবজান্তা। মানুষরাও কি কাজ করার জন্য সৃষ্টি হয় নি? মানুষরা যদি সবসময়েই কিছু-না-কিছু ইচ্ছেমত কাজ করতে পারে তবে আমিই-বা পারব না কেন? মানুষ আর রোবোট দুজনেই কাজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।

আমি রেগে যাই। বলি—হ্যাঁ, মানছি, দুজনেই কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু মানুষদের অনুভূতি থাকে, রোবোটদের থাকে না। যাদের কোনও অনুভূতি নেই, তাদের নিজস্ব চলাফেরার অধিকারও নেই।

—আপনি ভাবছেন আমার অনুভূতি নেই? এ কথা আমি মানি না। মা যখন আমার গায়ে হাত বুলায়, আমার ভাল লাগে। আমার শরীরের বিদ্যুৎ-প্রবাহ ত্বরান্বিত হয়। এটা কি ভাল লাগার লক্ষণ নয়? সবজান্তা আমাকে দৃঢ়কণ্ঠে তার মতামত জানায়।

সারাদিন খেটেখুটে অফিস থেকে ফিরছি। এতক্ষণ ধরে তর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন। তাই বললাম—দেখ বাপু, কি চাই তোমার সেটাই বল না সবজান্তা।

স্ত্রী অনুপ্রভা সস্নেহে সবজান্তার গায়ে হাত বুলালেন। বললেন—দাও না বাপু, ও যখন যা চায়, সেরকম কাজ করতে। খোকা তো আর আমাদের ক্ষতিকারক কোনও কাজ করবে না। ও ভারী লক্ষ্মী ছেলে। কি রে খোকা তাই না? স্নেহনির্ঝর গলায় বলে অনুপ্রভা।

ডঃ ভার্গব, আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলাম, অনুপ্রভার মমত্বময় কথাগুলো শুনতে শুনতে সবজান্তার কাঁচের স্বচ্ছ মাথায় দ্রুত হয়ে উঠল বিদ্যুৎপ্রবাহ। মনে হোল হঠাৎ যেন কিসের তাড়নায় ইলেকট্রীনক সার্কিটগুলো সতেজ হয়ে উঠেছে। মনে মনে ভাবলাম এটাই কি তবে সবজান্তা তার অনুভূতি বলছে?

আমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে অনুপ্রভা বললো—কিগো, খোকাকে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার অধিকার দাও না।

আমি রেগে বললাম—করুক না ও নিজের ইচ্ছেমত কাজ। সেটা করার বাধা কোথায়?

—কোথায় আবার, আমাদের ২নং ধারায় বলছে, মানুষের আদেশ ছাড়া কিছুই করতে পারব না। সেজন্যইতো আপনার আদেশ ছাড়া আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। আজ আপনার অনুমতি পেলাম, এবার ইচ্ছেমত কাজ করতে পারব। উত্তর দিল সবজান্তা।

তারপর অনুপ্রভার দিকে ফিরে বললো—মা, তুমি খুব ভাল।

—বিশ্বাস করুন স্যার, সবজান্তা, অনুপ্রভা, এদের ছেলেমানুষী দেখে তখন আমার বেশ মজা লাগতে সুরু করেছে। আমি হেসে বললাম—যাই কর হে সবজান্তা, ভুলো না ১নং আর ৩নং ধারাকে। যাই কর না কেন, এই ধারাগুলোর বাইরে কিন্তু তুমি যেতে পারছ না।

—নাঃ, নাঃ, সে সব বাধা মনে আছে আমার। ১নং ধারামতে মানুষের ক্ষতিকারক কোন কাজই করব না। আর ৩নং ধারামতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করব। মাস্টার সবজান্তা আনন্দে চঞ্চল হয়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। অনুপ্রভার চোখেও আনন্দের ঝিলিক।

আমি কিন্তু মাস্টার সবজান্তার এইসব কথাবার্তার কোনও বিশেষ গুরুত্ব দিই নি। মনে মনে ভাবলাম ইলেকট্রনিক সিস্টেম কোনও কারণে ফ্যাটিগ হয়ে গেছে। তাই কিছুটা আবোল-তাবোল কথা বলছে। তবুও হঠাৎ শেষকালে কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ হে সবজান্তা, হঠাৎ এত বছর পর তোমার মন কেমন করতে সুরু করল কেন?

একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয় রোবোট সবজান্তা—কি জানি, আজ সকাল থেকেই এই অনুভূতি দেখা দিয়েছে। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আজ সকালেই আপনার সংগে আমার হঠাৎ ধাক্কা লাগল। আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম। আমার নন-ব্রেকেবেল-গ্লাসের মাথাটায় আঘাত লাগল। ঠিক তার পর থেকেই সুরু হল এই অনুভূতি।

কথাটা শুনে সেই প্রথম আমার চিন্তা সুরু হোল। রোবোটটা মেঝেতে পড়াতে তার কেন্দ্রীয় নার্ভব্যবস্থায় কোনও সটসার্কিট হয়ে নতুন কিছু ঘটেছে কিনা দেখা দরকার। তা না হলে সবজান্তা এরকম অদ্ভুত আচরণ করছে কেন?

যাই হোক গতরাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছি। আজ সকালে উঠে আমার টেবিলের ওপর দেখি খোদাই করা এই কাঠের মূর্তিটা। আমি সবজান্তাকে জিজ্ঞেস করলাম—এটা আবার এখানে কে রাখল?

সবজান্তা উত্তর দিল—কে আবার, আমি রেখেছি। কাল রাত্রে এটা বানালাম।

—কাল রাত্রে বানালে! এত সূক্ষ্ম কাজ করবার জন্য কোনও কোড তো তোমার মেমারী সেলে আমি রেখে দিই নি? তবে বানালে কি করে? আমি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করি সবজান্তাকে।

—বাঃ, কাল সন্ধেবেলায় যে বললেন, আমি আমার খুশীমত কাজ করতে পারি, তাইতো এটা বানালাম। দেখুন না। ভাল হয়েছে কি না ?

অনুপ্রভা কখন যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঠের পুতুলটাকে ভাল করে দেখে বলে উঠল—বারে খোকা, তুই তো খুউব সুন্দর মূর্তি বানিয়েছিস ! —তারপর আমার দিকে ফিরে বললো—হ্যাঁগো, জিনিসটা দোকানে নিয়ে গিয়ে দেখ না। আমার মনে হয় পুতুলটা বেশ ভাল দামে বিক্রী করা যাবে।

—ডঃ ভার্গব, আপনিই বলুন, কি করে সবজান্তা একটা ইলেকট্রনিক-ভাবুক-রোবোটে পরিণত হল ? মেমারী কোডে ম্যাটার না থাকা সত্ত্বেও কি করে এরকম নিখুঁত একটা কাঠের মূর্তি তৈরি করল ?

চিন্তার ছাপ ভেসে উঠে ডঃ ভার্গবের মুখে। তিনি সবজান্তার দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ হে, এই কাঠের মূর্তিটা বানাতে কত সময় নিয়েছে ?

—কুড়ি মিনিট। সবজান্তা উত্তর দেয়।

—এই মূর্তিটার নক্সা পেলে কোথা থেকে ? আবার প্রশ্ন করেন ডঃ ভার্গব।

—কোথা থেকে আবার, নিজে ভেবে ভেবেই বার করেছি। মাথায় এল, চটপট তৈরি করে ফেললাম। বাগানে একটা সেগুন কাঠের টুকরো পড়েছিল। ডক্টর ঐ টুকরোটা ফেলেই দিয়েছিলেন। তাই ওটাকে কাজে লাগালাম।

ডঃ ভার্গব অবাক হয়ে তাকান সবজান্তার দিকে। ডঃ জোয়ারদার বলেন—স্যার, আমাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দিন। আমি সবজান্তার সংগে নিবিড়ভাবে কয়েকটা দিন থাকতে চাই। আর দরকার হোলে আপনার এই ল্যাবোরেটারি যাতে ইউজ করতে পারি তার অনুমতি দিন।

—কেন সত্যশংকর, তুমি কি কিছু অনুমান করছ ? অ্যানিথিং মিরাকুলাস ?

ডঃ জোয়ারদার স্থির চোখে তাকায় মাস্টার সবজান্তার দিকে। তারপর বলেন—ডঃ ভার্গব, প্লিজ লেট মি স্টাডি। আর একটা কথা স্যার, প্রয়োজনমত আমি যাতে রোবোসার্জেন ডঃ কিচলু আর রোবোনিউরোলজিস্ট ডঃ ব্রহ্মর সাহায্য পাই সেরকম অর্ডার দিয়ে রাখবেন। আমার বিশ্বাস, মাই লিটল মাস্টার সবজান্তা, রোবোট ইতিহাসে এক নতুন আলোক এনে দেবে।

—আই উইস্ ইওর সাক্সেস্ মাই ফ্রেন্ড। মনে রেখ, ডঃ ভার্গব ইজ উইথ ইউ। নির্ভরতার চোখে তাকিয়ে থাকেন ডঃ ভার্গব সহকর্মী রোবোসাইকলজিস্ট ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের দিকে।

জোয়ারদার মাথা নিচু করে ধন্যবাদ জানান। তারপর বলেন—মাস্টার, চল বাড়ি যাওয়া যাক।

রোবোট তাকায় জোয়ারদারের দিকে। তারপর ডঃ ভার্গবের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে—থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইওর কাইন্ডনেস্। ডক্টরকে কয়েকদিন সম্পূর্ণ করে কাছে পাব বলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সবজান্তার কথায় জোয়ারদার ও ভার্গব বিস্মিতভাবে মুখ চাওয়া-চাওই করে। কি আশ্চর্য! এ যে ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করছে সবজান্তা! সমস্ত কথাবার্তা যা হল সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছে বলেই ধন্যবাদ জানাল সে। তবে কি রোবোটের মধ্যে সত্যিই অনুভূতি আসতে পারে? কিন্তু কেমন করে? ইলেকট্রনিক সেণ্টারে অনুভূতি আসবে কেমন করে? এক অসহ্য উত্তেজনায় ডঃ ভার্গব আর ডঃ জোয়ারদার বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—ডক্টর, বাড়ি যাবেন না? অনেকটা সময় যে পার হোয়ে গেল। সবজান্তার শব্দ ভেসে আসে। হতবাক ডঃ জোয়ারদার ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনস্‌টিটিউটের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সংগে মন্থর পদক্ষেপে চলতে থাকে মাস্টার সবজান্তা।

২

বাড়িতে পেঁছালেন ডঃ জোয়ারদার। অনুপ্রভা উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছিল। জোয়ারদারকে আসতে দেখেই বললো—কিগো, ডঃ ভার্গব খোকাকে দেখে কি বললেন?

—ডঃ ভার্গব কিছু বলেন নি। তবে আমিই কয়েকটা দিন ছুটি নিয়েছি সবজান্তার সংগে গল্প করব বলে। সবজান্তাকে আমিই স্টাডি করতে চাই।

—বাঃ, বেশ ভালই হয়েছে। অনেকদিন আমরা এরকম ছুটি ভোগ করিনি।

—অনুপ্রভার গলায় খুশী-খুশী ভাব। —খোকা তোরা বস, আমি ডক্টরের জন্য চা করে আনছি। অনুপ্রভা চলে যায়।

ডঃ জোয়ারদার সবজান্তাকে বললেন—দেখ মাস্টার, আজ থেকে আমার ছুটি। এখন বল, তুমি কি করতে চাও?

সবজান্তা বলল—ডক্টর, আপনার সামনের চেয়ারটায় বসতে পারি? আপনারা তো রোবোটকে ক্রীতদাসের মত মনে করেন। কিন্তু, দাঁড়িয়ে থাকতে কি আমাদের সবসময় ভাল লাগে?

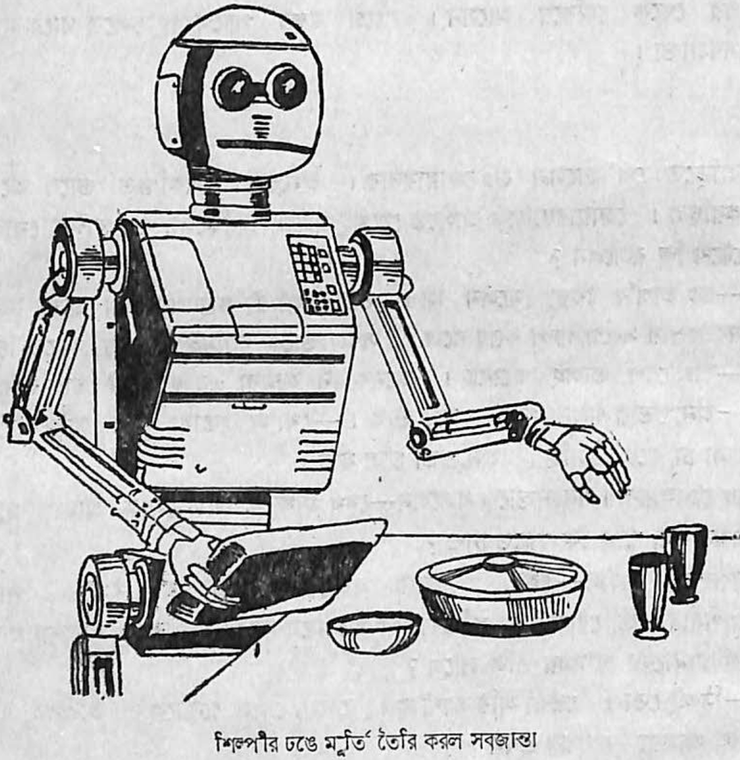
—ঠিকই তো। ভেরী সরি মাস্টার। বোস, বোস চেয়ারে। তারপর তুমিই বল, আমরা কি করব এখন?

—বাঃ, আমি তো রোবোট। আমি কখনও মানুষকে অর্ডার দিতে পারি? বরং আপনার কি ইচ্ছে তাই বলুন।

—নাইস। সুন্দর বলেছ মাস্টার। ২নং ধারামতে তুমি তো আমাকে অর্ডার দিতে পার না। তা এক কাজ কর, গতকাল যেরকম কাঠের মূর্তি তৈরি করেছ, সেরকম আরও কিছু মূর্তি তৈরি করা যাক, কি বল?

—বাঃ, সুন্দর হয়। আমরা তাহলে বাগানে যাই। কিছু কাঠের গুঁড়ি জোগাড় করতে হবে তো। সবজান্তার কণ্ঠে আনন্দের তরঙ্গধ্বনি।

ইতিমধ্যে অনুপ্রভা চা নিয়ে এল। চা খেয়ে বাগানে এল ডঃ জোয়ারদার, সংগে সবজান্তা। বাগান থেকে কাঠ এনে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দশটা মূর্তি তৈরি করে ফেললো সবজান্তা। প্রত্যেকটা মূর্তি বিভিন্ন ঢঙের, বিভিন্ন কারুকার্যের। অবাক হয়ে ডঃ জোয়ারদার আর তার স্ত্রী অনুপ্রভা দেখতে লাগলেন নিপুণ শিল্পীর ঢঙে কিরকমভাবে মূর্তিগুলো তৈরি করল সবজান্তা। মূর্তি তৈরি শেষ করে সবজান্তা তাকাল অনুপ্রভার দিকে। বললো—মা, মূর্তিগুলো কেমন হয়েছে ?



শিল্পীর ঢঙে মূর্তি তৈরি করল সবজান্তা

—অদ্ভুত ! অপূর্ব ! একই সংগে বলে ওঠেন অনুপ্রভা আর ডঃ জোয়ারদার।

—হ্যাঁগো, এত সুন্দর মূর্তি ! দেখ না, দোকানে বিক্রী করা যায় কি না ? বিক্রী করলে খোকা খুব খুশী হবে। কিরে, হবি না ? অনুপ্রভা সস্নেহে সবজান্তার দিকে তাকান।

—কি হে মাস্টার এগুলো বিক্রী হলে তুমি খুশী হবে ? ডঃ জোয়ারদারের কণ্ঠেও সস্নেহ জিজ্ঞাসা।

—বাঃ, হব না ? বিক্রী হলেই তবে বুঝব মানুষরা রোবোটদের সৃষ্ট শিল্পকলাকেও শ্রদ্ধা করে। সবজান্তার গলায় আবেগ-তরঙ্গ।
—হ্যাঁগো, চল না, এগুলো নিয়ে গিয়ে মার্কেটিং সেণ্টারে একবার যাচাই করি, যদি বিক্রী হয়। খোকা, তুই বরং বাড়িতে থাক। তোর মন যা চায় তাই করিস। দেখিস্, তোর তৈরি মূর্তিগুলো ঠিক বিক্রী হয়ে যাবে। অপত্য স্নেহ ঝরে পড়ে অনুপ্রভার গলায়। সবজান্তার স্বচ্ছ মস্তিষ্ক-গোলকে দ্রুত প্রবাহমান তরঙ্গধ্বনির উত্তেজনা তখন।
ডঃ জোয়ারদার আর অনুপ্রভা এসে পেঁছালেন মার্কেট সেণ্টারের হবি-হাউসে। হবি-হাউসের টেবিলের ওপর মূর্তিগুলো রাখতেই মনে হতে লাগল মূর্তি-গুলো যেন জীবন্ত। ম্যানেজার বললো—বাঃ, ভারী সুন্দর কাজ তো। ডক্টর, এগুলো তৈরি করল কে ?
—আমার ছেলে। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনুপ্রভা। —এগুলো বিক্রী করতে চাই। বলুন, কি দাম দেবেন ? উত্তেজিত কণ্ঠ অনুপ্রভার।
জহুরীর মত সজাগ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলো পরীক্ষা করেন ম্যানেজার। তারপর বলেন—দেখুন মিসেস্ জোয়ারদার, আপনাদের আমি চিট করতে চাই না। সত্যি বলতে কি, এত নিখুঁত শিল্পকলা আমি দেখিনি বললেই হয়। আমি এগুলো চাঁদের দেশের ফরেনারদের জন্য এক্সপোর্ট করতে চাই। সেজন্য আপনাদের রিসেনেবল প্রাইসই দেব। পাঁচশ টাকা পার পিস্। ডু-ইউ-এ্যাগ্রি ?
অর্থাৎ এই দশটা কাঠের মূর্তির দাম পাঁচ হাজার টাকা। আমার রোবোট সবজান্তা মাত্র কুড়ি মিনিটে পাঁচ হাজার টাকার জিনিস তৈরি করে ফেললো ! বিস্মিতভাবে চিন্তায় মগ্ন ডঃ জোয়ারদার। অনুপ্রভাও হতবাক।
ডঃ জোয়ারদারের নিস্তব্ধতা দেখে ম্যানেজার বলে—ডক্টর, অল রাইট, লেট দি প্রাইস বি সেভেন হাড্রেড পার পিস। আর এক কথা মিসেস্ জোয়ারদার, এরপর থেকে আপনার ছেলের তৈরি সব মূর্তি আমিই নেব। লেট আস হ্যাভ এন এ্যাগ্রিমেণ্ট ডঃ জোয়ারদার।
আবার চমকাবার পালা ডঃ জোয়ারদারের। এ্যাগ্রিমেণ্ট ! তার রোবোট সবজান্তার হয়ে এ্যাগ্রিমেণ্ট ! তারপর ডক্টর ভাবলেন, না, দেখাই যাক্ না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।
ডঃ জোয়ারদার বললেন—দেখুন ম্যানেজার, এই এ্যাগ্রিমেণ্টে যেতে আমি রাজী নই। আমার মিসেসের খেয়ালী ছেলে। এ্যাগ্রিমেণ্ট করলাম, আর তারপর যদি কোনও মূর্তি তৈরি না করে। তখন এ্যাগ্রিমেণ্ট রাখব কি করে ? আমি বরং আপনাকে কথা দিচ্ছি ওর তৈরি সব মূর্তি শুধু আপনাকেই বিক্রী করব। বলুন, কত মূর্তি চান ?

—দেখুন ডক্টর, এক সপ্তাহ পরে আমার একটা কনসাইমেণ্ট মুন-জোনে যাচ্ছে। আপনি সাতদিনের মধ্যে যতগুলো পারেন, মূর্তি ডেলিভারী দিন। পাঁচশ, হাজার, দু-হাজার পিস, অ্যাস ইউ প্লিজ।
—দেখি, কি করতে পারি। দশটা মূর্তির দাম সাত হাজার টাকা নিয়ে অনুপ্রভা আর ডঃ জোয়ারদার বাড়ি ফিরে আসেন।
জোয়ারদাররা বাড়িতে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সবজান্তা ড্রইংরুমে পায়চারী করছে। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখেই উৎকণ্ঠিত গলায় বলে ওঠে—মা, জিনিসগুলো বিক্রী হোল!
—হ্যাঁরে খোকা। সাত-হাজার টাকা পেলাম। এই নে টাকাগুলো। তুই মূর্তি বানিয়েছিস, এগুলো তোরই রোজগারের টাকা। অনুপ্রভা টাকাগুলো বাড়িয়ে দেন সবজান্তার দিকে।
সবজান্তা তাকায় ডঃ জোয়ারদারের দিকে। বলে—স্যার, মা এসব কি বলছে? আমি তো আপনারই রোবোট। রোবোট চিরকালই মানুষের অধীন। বলুন, আমাদের ২নং ধারা সেকথাই কি বলেনি?
—তা বলেছে বটে, কিন্তু এটাও তো ঠিক এই টাকা আমি রোজগার করি নি। বল, এই টাকা আমরাই বা কি করে রাখি?
—হ্যাগো, তোমার ল-ইয়ারের সংগে পরামর্শ কর না। খোকার গার্জেন হয়ে এসব টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যায় কি না? অনুপ্রভা এক নতুন উন্মাদনায় চঞ্চল।
—ঠিক আছে, ল-ইয়ারের সংগে না-হয় পরামর্শই করব। মাস্টার, একটা জরুরী কথা মন দিয়ে শোন। তুমি কি চার-পাঁচ দিনের মধ্যে এক-হাজার কাঠের মূর্তি বানিয়ে দিতে পারবে? তা হলে সাত লাখ টাকা পাওয়া যাবে। সে টাকা পেলে তোমাকে নিয়ে একটু পরীক্ষা করতে চাই। তোমার টাকায় তোমার পরীক্ষা হবে, তাই কেউ আপত্তি করতে পারবে না। ধীর গলায় বলেন, ডঃ জোয়ারদার।
—বাঃ, বেশ মজাতো! কিন্তু, কি পরীক্ষা হবে স্যার?
—তোমাকে আরও কতটা মানুষ করে তোলা যায় তাই পরীক্ষা করব মাস্টার। হয়ত তার জন্য কয়েকটা অপারেশনও করতে হতে পারে।
—না, খোকার উপর কোনও অপারেশন চালাতে দেব না। শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত গলায় বলে ওঠে অনুপ্রভা।
—মা, ভয় পাচ্ছ কেন? তুমিই বল, আমি তো তোমার সত্যিকারের ছেলে নই। আমি তো শুধু রোবোট। কিন্তু মা, তুমি যখন দুঃখ পেলে কাঁদ, তখন রোবোট হয়েও কেন আমার কষ্ট হয়? মানুষের মত আনন্দে কেন আমার হাসতে ইচ্ছে করে? এই অনুভূতি হঠাৎ কেন এল সেটা যদি ডক্টর বার

করতে পারেন, তাহলে হয়ত আমি সত্যি মানুষের মত হয়ে যাব। তখন আমি সত্যিকার তোমার ছেলে হয়ে যাব মা। লক্ষ্মীটি মা, ডক্টরকে মত দাও। —করুণ আর্তি সবজান্তার গলায়।

—না, না, কিছুতেই না। আমার বড় খোকাকে কতদিন আগে হারিয়েছি। তুই রোবোট হলেও তুই-ই এখন আমার সেই হারিয়ে যাওয়া খোকা। অপারেশন করতে গিয়ে যদি তোর ক্ষতি হয়, তবে আমি মরে যাব খোকা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অনুপ্রভা।

—সোনা মা, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর। এই যে যতক্ষণ না তোমরা মার্কেটিং সেণ্টার থেকে ফিরছিলে, ততক্ষণ আমার কি উত্তেজনা ছিল। আমার শরীরে কি রেটে কারেণ্ট-ফ্লো হচ্ছিল তা কল্পনাই করতে পারবে না। সবজান্তা বোঝাতে চেষ্টা করে অনুপ্রভাকে।

কথা বলেন ডঃ জোয়ারদার। —মাস্টার, তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। তাই তো বলছি, কি বল, এইবার দুজনে মিলে চেষ্টা করা যাক। মানুষের মত অনুভূতি তোমার আসছে কোথা থেকে জানা দরকার। রোবোট কেন অনুভূতিশীল? নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্ন করেন ডঃ জোয়ারদার।

সবজান্তার কথায় সবার সম্বিত ফেরে। —স্যার, আপনি আমাকে মানুষের মত করে তুলুন। আমি যেন সত্যিকারের ছেলে হয়ে উঠি মার কাছে। ওঃ, কি উত্তেজনা! আমি মানুষ হব! স্যার, কবে চাই মূর্তিগুলো? কতগুলো মূর্তি? হাজার না তারও বেশি চাই?

—যা পার তৈরি কর না। ডঃ জোয়ারদার অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেন। মনে তখন তুফান উঠেছে সাইকলজিস্টের, অনুভূতি কি করে সৃষ্টি হয় রোবোটে? আর সেই মুহূর্তে অসহায় দৃষ্টিতে স্বামী আর রোবোট—পুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে অনুপ্রভা।

এরপর চার দিন ধরে বিভিন্ন রকমের মূর্তি বানালো সবজান্তা। আর ডঃ জোয়ারদার বিভিন্ন বই নিয়ে ডুবে থাকলেন। অনুভূতি কি করে সৃষ্টি হচ্ছে, তার উৎপত্তিস্থল কি, সেই অনুভূতি তরঙ্গায়িত হচ্ছে কোন তন্ত্রীগুলোর মধ্য দিয়ে তাই নিয়ে চললো চিন্তাভাবনা। মাস্টার রোবোট সবজান্তা, এক নতুন চিন্তার জগত খুলে দিয়েছে তার সামনে।

ইতিমধ্যে ডঃ জোয়ারদার ইণ্ডিয়ান রোবোট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির লোকাল এজেণ্টের সংগে দেখা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের তৈরি রোবোট কতদিন সার্ভিস দেয়?

এজেণ্ট উত্তর দিল—দেখুন স্যার, বিশ বছরের গ্যারাণ্টী সবসময়েই আমরা দিই। কেন, এর মধ্যে আপনার রোবোটে কোনও ট্রাবল হয়েছে?

—হ্যাঁ, আজ দিনকয়েক হোল রোবোট নিজের ইচ্ছেমত কাজ করছে। অবশ্য

রোবোটিক তিনটে আইন এখনও সে ভাঙ্গে নি। তবে জানতে চাইছি, আজ কুড়ি বছর পর রোবোট হঠাৎ খুশীমত চলতে চাইছে কেন?

—দেখুন স্যার, পসিট্রনিক রেখাপথের হিসেব-নিকেশ ভীষণ কঠিন, তাই চট করে আপনাকে বোঝাতে পারব না। তবে এটা আপনিও জানেন, এই পসিট্রনিক রেখাপথই রোবোট চালোনার মূল কথা। স্যার, আপনার রোবোটটা যখন গোলমাল করছে নিয়ে আসুন, আমরা বিনা পয়সায় বদলে দেব।

—না, আমি বদলাবার জন্য আসিনি। আমি জানতে এসেছি এর আগে এ জাতীয় কমপ্লেন আপনারা পেয়েছেন কি না? রোবোট, ভাবুক রোবোট হয়ে যায় কি না?

—না স্যার, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা রোবোট বিক্রী করছি। এ জাতীয় কমপ্লেন এই প্রথম। আপনি বলছেন আপনার রোবোট ভাবুক ইলেকট্রনিকের মত ব্যবহার করছে? না স্যার, এ জাতীয় ঘটনাও এই প্রথম শুনলাম। আচ্ছা স্যর, আপনার রোবোট নিজের ইচ্ছেমত কি কাজ করেছে বলুন তো?

—এই দেখুন তার একটা নমুনা। ডঃ জোয়ারদার কাঠের কাজ-করা একটা মূর্তি বার করে এজেণ্টের হাতে দিল। বলল—দেখেছেন, কি অদ্ভূত কাজ করেছে আমার রোবোট!

—রোবোট বানিয়েছে! নিজের ইচ্ছেমত! হাউ স্ট্রেঞ্জ! আপনি স্যার পরশু আসুন। আমি আজই আমাদের চিফ সায়েণ্টেফিক অবসারভার মিঃ জেকবকে মেসেজ পাঠাচ্ছি। রিয়েলি এ স্ট্রেনজ কেস।

ডঃ জোয়ারদার বাড়ি ফিরে এলেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ তাঁর। মাথায় শুধু এক চিন্তা, কি কারণে একটা সাধারণ রোবোট আত্মসচেতন ভাবুক রোবেটে পরিণত হয়ে যায়?

দুদিন পর ইন্ডিয়ান রোবোট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ঘরে বৈঠক বসল। বৈঠকে ডাঃ জেকব, কোম্পানির চিফ রোবোবাওলজিস্ট সহ আরও যাঁরা উপস্থিত হলেন তাঁরা হচ্ছেন ডঃ হরিরাম ভার্গব, ডাইডেক্টর ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনসটিটিউট, চিফ রোবোসার্জেন ডাঃ কিচলু, রোবোনিউরোলোজিস্ট ডাঃ ব্রহ্ম, আর রোবোসাইকলজিস্ট ডঃ জোয়ারদার।

দীর্ঘ চারঘণ্টা আলোচনার পর স্থির হোল রোবোট সবজান্তার এই আচরণের প্রথম কারণ—পড়ে গিয়ে তার স্মৃতি সেণ্টারে হঠাৎ আঘাত লাগা। দ্বিতীয় কারণ—আঘাতের পর স্মৃতিভাণ্ডারের সারকিট সিস্টেমে কিছু সর্ট-সার্কিটিং হওয়া। তার ফলে পসিট্রনিক রেখাপথে কোনও বিপর্যয় ঘটা। এই সমস্ত সঠিক দেখার জন্য রোবোট সবজান্তার অপারেশন অবশ্যম্ভাবী।

ডঃ জেকব বললেন—দেখুন ডঃ ভার্গব, মানুষের নার্ভব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র যোগাযোগ লাইন যার সাহায্যে সমস্ত সংবেদন, অনুভূতি মস্তিষ্ক কোষে

পেঁছায়। মানুষের নার্ভ-ব্যবস্থা হচ্ছে রেডিও সিস্টেমের মত। রেডিওর কনডাক্টারের মত নার্ভসিস্টেমেও কনডাক্টার আছে। কিন্তু এই রোবোটের বেলায় সেরকম কোনও নার্ভব্যবস্থা নেই। মানুষের মস্তিষ্কের মত তার গঠনও নয়ও।

ডঃ ভার্গব বললেন—শুধু তাই কেন, মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার অফুরন্ত। পরি-পার্শ্বের সংস্পর্শের ফলে, প্রাণন-ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ অফুরন্ত সংবেদন লাভ করে। আর এই সংবেদন একগুচ্ছ মস্তিষ্ককোষে জমা থাকে। এই তো নিউরোন। এই নিউরোনের সংখ্যা কোটি-কোটি। প্রকৃতির সংস্পর্শে, তার পর্যবেক্ষণে, প্রাত্যহিক চলাফেরার ফলে কেন্দ্রীয় নার্ভব্যবস্থায় দেখা দেয় বহু অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গ প্রকৃতিকে নকল করে। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডারের বিভিন্ন কক্ষে এই অনুষঙ্গ মুদ্রিত হয়ে থাকে কোডবদ্ধ সংকেতরূপে। প্রয়োজন-বোধে, কথা বা কাজের আকারে সেই কোডবদ্ধ স্মৃতি প্রকাশিত হয়। এ সমস্তই মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব, রোবোটের ক্ষেত্রে নয়। রোবোটের ক্ষেত্রে নিউরোন সৃষ্টি হয় না বলেই রোবোটের কেন্দ্রীয় স্মৃতিভাণ্ডার নিজের ইচ্ছেমত কাজ করবার জন্য উপযুক্ত নয় বলে মেনে নিতে হবে। তাই আমাদের প্রথমেই জানা দরকার, ডঃ জোয়ারদারের রোবোটের স্মৃতিভাণ্ডারে হঠাৎ নিউরোন সৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে ?

ডঃ ব্রহ্ম বললেন—দেখুন, অপারেশনে বিনা কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এটা দেখা যাচ্ছে যে সবজান্তার সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোলে মানুষের নার্ভসিস্টেমের মত কিছু সেনসিটিভ ওয়েভস তৈরি হচ্ছে, আর যার ফলে হি হেজ বিহেভিং লাইক এ ম্যান। সো, উই মাস্ট ফাইণ্ড দি রিসিন ওনলি আফটার অপারেশন।

সবাই তাকালেন ডঃ কিচলুর দিকে। সবার প্রশ্ন, চিফ-রোবোসার্জেনের পক্ষে এই অপারেশন করা কি সম্ভব ?

ডঃ জোয়ারদার এবার বললেন—সবজান্তার অপারেশন হবেই। তিনদিন পরে, কিন্তু আগে নয়।

সবাই একসংগে জিজ্ঞেস করল—হোয়াই নট টু-মরো ? দেরী করলে এই আননোন্-ওয়েভটা হয়ত হঠাৎ থেমেও যেতে পারে।

—তা পারে ডক্টর। কিন্তু সবজান্তা আমার রোবোট। তাই এ ব্যাপারে আমার মতামতই কি শেষ নয় ? আপনারা জানেন, কারণ ছাড়া ডঃ জোয়ারদার কিছু বলে না।

ডঃ ভার্গব বুঝতে পারলেন তার সহকর্মীর এই মন্তব্য কতটা খাঁটি। তিনি বললেন—না, না। ডঃ জোয়ারদার যা বলবেন তাই ফাইনাল। এখন বলুন, কবে হবে অপারেশনের ডেট ?

—আজ থেকে পঞ্চম দিনে, অর্থাৎ শুক্রবার হবে অপারেশন। লেট মাই

রোবোট বি মেণ্টালিবিষ প্রিপেয়রড্ ফর দিস্ অপারেশন। ডঃ জোয়ারদার স্থির গলায় বলেন।
—ওকে দিস্, ইজ ফাইনাল। ডঃ জেকব বললেন। দীর্ঘ চারঘণ্টার আলোচনা শেষ হোল। ডঃ জোয়ারদার ফিরে এলেন বাড়িতে। বাড়িতে এসে দেখেন সবজান্তা একমনে কাঠের মূর্তি তৈরি করছে। আর সস্নেহে তাই দেখছে অনুপ্রভা।
ডঃ জোয়ারাদারের পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল সবজান্তা। জিজ্ঞেস করলেন ডঃ জোয়ারদার—আজ পর্যন্ত কটা মূর্তি তৈরি হলো সবজান্তা ?
—৮৯০টা। মনে হচ্ছে, কালকেই হাজার মূর্তি তৈরি হয়ে যাবে।
—বাঃ, খুব ভাল। কালই তবে মার্কেটিং সেণ্টারে দিয়ে আসব মূর্তিগুলো। হ্যাঁ, আর একটা কথা সবজান্তা, আজ তো সোমবার, আগামী শুক্রবার তোমার অপারেশন, মানুষ হওয়ার।
—সামনের শুক্রবারই ! ওঃ স্যার, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। আমি মানুষের মত হয়ে যাব ?
—যাবে বৈকি সবজান্তা ! আমি তো তোমাকে মানুষই তৈরি করতে চাই। মানুষের চেয়ে তোমার ক্ষমতা কোথায় কম, বল ?
সবজান্তা চুপ করে থাকে। এক লালচে আভার তরঙ্গ ওর শরীরে। মনে হচ্ছে, কথাগুলো শুনে যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে সবজান্তা।
অনুপ্রভার চোখ ছলছল করে ওঠে। বলে—হ্যাঁগো, সত্যি বলছ খোকার কোনও ক্ষতি হবে না ? ও সত্যি মানুষ হয়ে উঠবে ? হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের খোকা হয়ে যাবে ?
—যাবে গো, যাবে। নরম গলায় বলেন ডঃ জোয়ারদার। কিন্তু মনে তার ঝড় ; সত্যিই কি হবে তাই ?

৩

দ্রুত সময় পার হতে লাগল। মঙ্গলবার দিন এক হাজার মূর্তি ডেলিভারী দিল ডঃ জোয়ারদার মার্কেটিং সেন্টারের ম্যানেজারকে। তারপর সাত লাখ টাকার চেক নিল। চেকটা তৈরি হোল মাস্টার সবজান্তা আর ডঃ জোয়ারদারের জয়েণ্ট নামে।
জোয়ারদার তারপর ছুটল অ্যাডভোকেটের কাছে। পাওয়ার-অফ-অ্যার্টনি তৈরি করল তার নামে, যাতে মাস্টার সবজান্তা তার ব্যাঙ্ক অপারেশন, করস-পণ্ডেস ইত্যাদি সবকিছুর অথরিটি দিচ্ছে ডঃ জোয়ারদারকে। সেদিনই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হল সবজান্তার নামে। ব্যাঙ্ক অপারেট করার অথরিটি থাকল ডঃ জোয়ারদারের।

বাড়ি ফিরে জোয়ারদার ডাকল সবজান্তাকে। সবজান্তা ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল। —কিছু বলবেন স্যার ?
—হ্যাঁ মাস্টার, এই নাও তোমার পাশ বই। আজ তোমার নামে জমা পড়ল ব্যাঙ্কে, ক্যাশ সাত হাজার টাকা আর চেকে সাত লাখ টাকা। মোট সাত লাখ সাত হাজার টাকার মালিক তুমি। তোমার তৈরি মূর্তি থেকেই এই টাকা তুমি পেয়েছ। এই টাকা দিয়েই তোমার অপারেশন হবে। অর্থাৎ তোমার নিজের টাকায় তুমি তোমার চিকিৎসা করাচ্ছো ঠিক মানুষের মত। এটাই তোমার মানুষ হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।
—থ্যা—ঙ্ক ইউ স্যার। আই উইল বি এ্যভার গ্রেটফুল টু ইউ। ঠিক মানুষের আবেগে সবজান্তার কথাগুলো কাঁপতে থাকে।
অনুপ্রভা সবজান্তার মেটালিক বডিতে সস্নেহে হাত বুলায়। বলে—খোকা, তুই যেন সত্যিই মানুষ হয়ে যাস্ রে।
বুধবার আর বৃহস্পতিবার নানান গল্পগুজবে, হাসি আনন্দে দিন কাটিয়ে দেয় ডঃ জোয়ারদার, অনুপ্রভা, আর সবজান্তা। কিন্তু সবার মনেই উত্তেজনা, রোবোট-সবজান্তার আগামী অপারেশনের সাফল্য নিয়ে।
শুক্রবার সকালে মাস্টার সবজান্তাকে নিয়ে ডঃ জোয়ারদার রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। অনুপ্রভা বলে উঠল—না, খোকার সঙ্গে আমিও যাব। ওকে তোমার হাতে একলা ছেড়ে দেব না।
ডঃ জোয়ারদার বিব্রত হলেন। বললেন—অপারেশন হলে তুমি থাকবে কি করে ? অনুপ্রভা ভীষণ কান্নাকাটি সুরু করল।
সবজান্তা চঞ্চল হয়ে উঠল অনুপ্রভার কান্নায়। বলে উঠল—ডক্টর, চলুক না মা আমার সঙ্গে। দেখুন, মা কোনও অসুবিধে করবে না।
অপারগ ডঃ জোয়ারদার সবজান্তা আর অনুপ্রভাকে নিয়ে ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনস্‌টিটিউটের অপারেশন রিসার্চ রুমে পেঁছালেন। ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজছে। অপারেশন রুমে আগে থেকেই এসে হাজির হয়েছেন চিফ-রোবোসার্জেন ডাঃ কিচলু আর রোবো-নিউরোলজিস্ট ডাঃ ব্রহ্ম। ডাঃ ভার্গব আর ডঃ জেকব তখনও এসে পেঁছান নি।
ঘরে ঢুকেই সবজান্তা সবার দিকে একবার তাকাল। তারপর খুব নরম-স্বরে বলে উঠল—গুড মর্নিং স্যার। আই উইস্ ইওর সাক্সেস।
ডাঃ কিচলু হেসে বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ মাস্টার। মনে হচ্ছে এই অপারেশন হওয়ার জন্য তুমি খুব খুশী ?
—নিশ্চয় স্যার। আর এর জন্য আমি আমার মাস্টার জোয়ারদারের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, আপনারা সবাই আমার ওপর এত সহানুভূতিশীল না হলে আজ কি আমি এখানে উপস্থিত হতে পারতাম ?

ডঃ ব্রহ্ম এবার এগিয়ে এলেন মাস্টারের দিকে। বললেন—মাস্টার, তোমার পসিট্রনিক ব্রেন ভীষণ ইমপ্রুভড্ হয়েছে। তাই সেটা স্টাডি করার জন্যই আমরা এসেছি। নাউ লেট আস স্টার্ট আওয়ার প্রিলিমিনারিস। প্লিজ, না জিজ্ঞেস করলে আর একটাও কথা বোল না। তোমার অপারেশন শুরু হতে যাচ্ছে। উই হোপ, ইউ উইল এক্সটেন্ড অল উওর কো-অপারেশন।

—বাই অল মিনস্ ডক্টর। রোবট সবজান্তা টেবিলে শুয়ে পড়ে। অনুপ্রভা দ্রুত টেবিলের পাশে আসে। সবজান্তার স্বচ্ছ মাথায় কম্পিত আবেগে স্নেহ-চুম্বন এঁকে দেয়। বলে—খোকা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুই মানুষ হয়ে ওঠ্।

সাইলেন্স মার্কা লাল আলো জ্বলে ওঠে ঘরে। অনুপ্রভা চুপ করে একপাশে ঘরের কোণে চলে যায়। ডঃ ব্রহ্ম বললেন—দেখুন ডঃ কিচলু, এই কয়দিনের ঘটনা ডঃ জোয়ারদারের কাছে যা শুনলাম, তাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস সবজান্তার এই সেনসিটিভনেসের মেইন সোরস তার পসিট্রনিক ব্রেন আমার জানা দরকার, অন্যসব রোবোটদের ও পসিট্রনিক ব্রেনে এই ধরনেরই সার্কিট আছে কিনা ?

কথার মাঝখানেই ডঃ জেকব আর ভার্গব এসে পৌঁছালেন। ডঃ ভার্গব জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ জেকবকে—আচ্ছা, আপনার এই মডেল কুড়ি বছর আগের, তাই তো ? আপনি বলতে পারেন ঠিক এ জাতীয় আর কটা মডেল আপনারা বিক্রী করেছিলেন ? কেন না জানা দরকার একই মডেল একই রকম বিহেব করছে কিনা ?

ডঃ জোয়ারদার বলে ওঠেন—ডঃ জেকব, মনে রাখবেন, সবজান্তার এই ভাবুক হাবভাব পসিট্রনিক ব্রেনের মাটিতে আঘাত লাগার পরেই হয়েছে। সুতরাং জানা দরকার এই জাতীয় ব্রেনে সাডেন হ্যামারিং-এর কি এ্যাফেক্ট।

ডঃ জেকব বললেন—নরম্যালি আমাদের তৈরি কোন রোবোটই পঁচিশ বছরের আগে কোনও ট্রাবল দিয়েছে বলে শুনিনি। আর ত্রিশ বছর হলেই আমরা রোবোটকে চেঞ্জ করার জন্য জেনারেল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। কেননা রোবোটের পসিট্রনিক ব্রেন ততদিনে ফ্যাটিগ্ হয়ে যায়। এই রোবোট মাত্র কুড়ি বছর কাজ করছে। তাই আমাদের মতে রোবোট নরম্যাল থাকারই কথা। আমরা এক এক লটে হাজার রোবোট তৈরি করি। তবে সত্যি বলতে কি, প্রত্যেকটা রোবোটের মধ্যে দশ পারসেন্ট ভেরিয়েশন থাকেই। দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান্টেড টু আইডেন্টিফাই ইচ রোবোট।

ডঃ জোয়ারদার জিজ্ঞেস করলেন—রোবোট ট্রাবল দিলে আপনারা কোন কোন পার্টস চেঞ্জ করেন ?

ডঃ জেকব বললেন—আপনারা জানেন, পসিট্রনিক ব্রেন আমরা চেঞ্জ করি না, কেননা ওটা সিলড্ ইউনিট। এ ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুই বদল করে দিতে পারি।

পসিট্রনিক ব্রেন খারাপ হলে আমরা বলব রোবোট ইজ ডেড্। কিন্তু অন্যান্য পার্টস সবসময়েই চেঞ্জেবেল। এই ধরুন না কেন, আমাদের লেটেস্ট মডেলে আমরা অ্যানড্রয়েডস ব্যবহার করছি। তার ফলে সেই রোবোটদের বাইরের চেহারা মানুষের গায়ের চামড়ার মত দেখতে হয়ে যাচ্ছে। গায়ের রংটাও ঠিক মানুষের গায়ের রং-এর মত করা হয়েছে সিনথেটিক ফাইবার ম্যাটার ব্যবহার করে। কোনও ধাতব পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে না, শুধু পসিট্রনিক ব্রেন ছাড়া অন্য কোথাও। ফলে আমাদের লেটেস্ট মডেলের রোবোটগুলো মানুষের ওজনের মাত্র দেড়গুণ। দেখতেও হয়েছে মানুষের মতই। তবে অ্যানড্রয়েড্ স্কীনের রোবোট ভীষণ দামী। তাই বাজারে একটাও বিক্রী হয় নি। আমরা এগুলোকে নাম দিয়েছি অরগ্যানিক-রোবোট।

ডঃ জোয়ারদার বলে উঠলেন—আচ্ছা, তাহলে আমার এই রোবোটকেও অরগ্যানিক রোবোটে কনর্ভার্ট করা যায় ?

—নিশ্চয়ই। তার জন্য আপনাকে কনভারশন ফি দিতে হবে পাঁচ-লাখ টাকা। ফি দিয়ে আজকের এই অপারেশনের সঙ্গেও কনভারশন করে নিতে পারেন।

—আপনি পাঁচ-লাখ টাকাই পাবেন ডঃ জেকব। একে অরগ্যানিক রোবোটে কনভার্ট করুন। বলে উঠলেন ডঃ জোয়ারদার।

সবাই অবাক হয়ে তাকান ডঃ জোয়ারদারের দিকে। ডঃ ভার্গব বলে ওঠেন—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? এমনই দেখছ আজকের এই অপারেশন মানেই কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ। তার ওপর অহেতুক খরচা হবে এই অরগ্যানিক-মেমব্রেন তৈরির জন্য ! নো, দিজ ক্যান নট বি অ্যালাউড।

—স্যার, আমরা এটা বন্ধ করি কি করে ? পাঁচ-লাখ টাকা আর আজকের অপারেশন ফি সবই যখন সবজান্তা নিজেই দিচ্ছে তখন আর আমাদের করার কি আছে বলুন ?

—হোয়াট ! সবজান্তা পাঁচ লাখ-কুড়ি হাজার টাকা দেবে ? বাট হাউ ?

—এই যে স্যার ব্যাঙ্কের পাশ বই। ওর জমা আছে সাত লাখ সাতহাজার টাকা। এই টাকা ওই আর্ন করেছে।

—আই সি ! রিয়েলি, অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। অলরাইট, স্টার্ট ফর অপারেশন অ্যান্ড কনভারশন। বললেন ডঃ ভার্গব।

ডঃ কিচলু দ্রুত হাতে সবজান্তার মেটালিক বডি খুলে ফেলল। তারপর পসিট্রনিক ব্রেনটা বার করে আনলো। ডঃ কিচলু বললেন—দেখুন তো ডঃ জেকব, আপনাদের অরিজিনাল সারকিটস্ আছে, না কিছু চেঞ্জড হয়েছে ?

ডঃ জেকব এক্সরে বীম প্রজেক্ট করে ব্রেনের নানান ছবি তুলে ফেললেন। তারপর অরিজিনাল সারকিট লে-আউট প্ল্যানটা পাশে ফেলে ঝুঁকে দেখতে

লাগলেন। তারপর বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—মাই গড! এযে দেখছি নতুন লে-আউট সার্কিট! এত বদল হল কি করে!

ডঃ ব্রহ্ম বলে উঠলেন—সাডন হ্যামারিং এফেক্টই কারণ ডঃ জেকব। সাডেন হ্যামারিং-এ চৌম্বক শক্তি আর তার পরিধির বিবর্তন ঘটেছে। আর তার সঙ্গে নিউ পাথওয়েভ সৃষ্টি হয়েছে। এই পাথওয়েভই মানুষের নার্ভসিস্টেমের মূল যোগাযোগ লাইনের কাজ করছে। তাকিয়ে দেখুন, অন্য রোবোটের হাত পায়ের আর্মসে এত হাই ফ্রিকোয়েন্সী কারেন্ট ফ্লো তো দেখিনি।

সবাই ঝুঁকে দেখতে লাগল। ডঃ ভার্গব বললেন—মে বি। এটা হতে পারে। রোবোসার্জেন ডঃ কিচলু বললেন—আমার মতে এর হাইলি ডেভেলপড স্পেশাল পসিট্রনিক ব্রেনকে ওপন করা ঠিক হবে না। দেখছি, এখনও এর ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। ওপন করে রিসেট করলে এই স্পেশাল ফ্লেক্সিবিলিটি হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। বলুন, আপনাদের মত কি?

ডঃ জোয়ারদার বলে উঠলেন—স্যার, আপনারা সবাই ভুলে যাচ্ছেন আজকের অপারেশনের খরচটা রোবোট পেশেন্ট নিজেই করছে। তার হয়ে কথা বলার অথরিটি শুধু আমারই আছে। তাই আমার মতই ফাইনাল। সবজান্তার এই ব্রেন ওপন হবে না। আমরা দেখতে পেয়েছি সাডেন হ্যামারিং-এ পসিট্রনিক ব্রেন নতুন পাথওয়েভ তৈরি করেছে, তা আশ্চর্যভাবে মানুষের নার্ভসিস্টেমের মতই কাজ করছে। সেটা নষ্ট হওয়ার চান্স নিতে পারছি না। এখন শুধু এতে অরগ্যানিক বডি ফিট করুন। তাহলে আমি সুখী হব।

ঘন্টাখানেকের পর অপারেশন শেষ হল। মাস্টার সবজান্তার চেহারাটা মানুষের মত হয়ে গেল। মানুষের মত গায়ের রঙ। হাত-পা ঠিক মানুষের মত। এমনকি মাথাটাও মানুষের মত, শুধু একটু সাইজে বড়। মাথায় পরচুলা বসানো। মনে হল, সত্যিই বুঝি অপারেশন টেবিলে একটা উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে ঘুমাচ্ছে।

অধীর আগ্রহে সবাই রোবোট-মানুষটার দিকে তাকিয়ে। অনুপ্রভার চোখ-দুটো অধীর উৎকন্ঠায় সবজান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে। আধঘন্টা কেটে গেল। সবজান্তার কোন সাড়া-শব্দ নেই। তাহলে কি অপারেশন ডিফেক্টিভ হল? সবাই খুব উদ্বিগ্ন চোখে সবজান্তার দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো—বড় ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—কথা বলছে, মাস্টার কথা বলেছে।

মাস্টার রোবোট উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে চলতে সুরু করল। তারপর এসে দাঁড়ালো রোবোসার্জেন ডঃ কিচলুর দিকে—মাই হার্টিয়েস্ট গ্র্যাটিচুট স্যার। তারপর ডঃ জোয়ারদারের দিকে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল—স্যার, আমি কি মানুষের মত হয়েছি?

ডঃ জোয়ারদার মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন—এসো আমার সঙ্গে মাস্টার। নিজেই নিজেকে দেখে নাও। ডঃ জোয়ারদার এসে দাঁড়ালেন অপারেশন থিয়েটারের একদিকে, লম্বা আয়নাটার সামনে।

সবজান্তাও এসে দাঁড়াল আয়নার সম্মুখে। বারবার নিজেকে দেখলো। তারপর আনন্দে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো—ডক্টর, আমি মানুষ হয়ে গেছি! মানুষ হয়ে গেছি। এই দেখুন, ঠিক আপনাদের মত আমার শরীরের চেহারা হয়ে গেছে! মাথাই ঠিক আপনাদের মতই! চোখ-নাক ঠিক মানুষের মত! আঃ, তাহলে শেষকালে আমি সত্যিই মানুষ হয়ে গেলাম!

ডঃ জোয়ারদার বললেন স্নিগ্ধ গলায়—মাস্টার তোমার চেষ্টায় তুমি মানুষ হয়েছো। তুমিই তো প্রথম রোবোট যে সত্যিকার মানুষ হলো। আজ থেকে তুমি আর আমার অধীন নও। আজ থেকে তুমি স্বাধীন হয়ে গেলে। রোবোট নং-২ রুল আজ থেকে তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়।

—স্যার! বিস্মিত গলায় বলে সবজান্তা।

—স্যার বলছ কেন মাস্টার। শুধু বল, ডঃ জোয়ারদার। এখন থেকে তো আমি আর তোমার মাস্টার নই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

—না, পারে না। খোকা তুই-ই যে হারিয়ে যাওয়া খোকন আমার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সবজান্তাকে জড়িয়ে ধরেন অনুপ্রভা। —না, আমি তোকে কোথাও যেতে দেব না।

—মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। বিশ্বাস কর মা, আমি তোমার খোকন হতে চাই বলেই তো মানুষ হয়েছি। কান্নাভেজা কণ্ঠ ঝরে পড়ে সবজান্তার।

—খোকন আমার। রোবোট-সবজান্তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরেন অনুপ্রভা।

অপারেশন রুমের ক্যালেণ্ডারের তারিখ তখন জ্বলজ্বল করছে—১৮ই মে, ২০৩০ খৃীস্টাব্দ।

সার্জেন রোবো—নবারুণ

১৮ই মে ২০৩০ খৃষ্টাব্দ ডঃ সত্যশংকর জেয়ারদারের জীবনের এক স্মরণীয় দিন। রোবো-সাইকলজিস্ট ডঃ জোয়ারদারের পারসোন্যাল রোবোট সবজান্তা, আজ, এইদিনেই মানুষের মত অনুভূতিশীল হয়ে উঠলো। দেখতে ঠিক মানুষের মত। রোবোনিউরলজিস্ট ডঃ ব্রহ্ম, ইণ্ডিয়ান রোবোট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির চিফ রোবোবাওলজিস্ট ডঃ জেকব আর ডঃ ভার্গব--ডাইরেক্টর ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনসটিটিউডের যুক্ত প্রচেষ্টায় রোবোসার্জেন ডঃ কিচলুর অপারেশনে রোবোট সবজান্তার গায়ে এনড্রাইভ স্কীন-বডি লাগানো হোল। রোবোট সবজান্তার চেহারা হয়ে উঠলো মানুষের মত। চোখ-নাক ঠিক মানুষের মত, মাথা-চুলের ঢঙও যেন একদম মানুষেরই।

সবজান্তাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন ডঃ জোয়ারদার আর তাঁর স্ত্রী অনুপ্রভা। খুশী ঝরে পড়ছে স্বামী-স্ত্রীর চোখে। তারই ঝলক যেন রোবোট সবজান্তার মানুষী চোখের তারায়।

বাড়িতে পেঁছে মিসেস অনুপ্রভা জেয়ারদার বললেন—হ্যাঁগো, তুমি তো খোকনকে স্বাধীন করে দিলে। ও যদি এখান থেকে চলে যায় তবে আমার কি হবে? বেদনার্ত কণ্ঠ অনুপ্রভার।

—দেখ অনু, তুমি তো সবজান্তাকে ছেলের মতই ভালবাস। আজ তার মানুষের মত অনুভূতি হয়েছে, চেহারা হছে। এই অবস্থায় তাকে কি আমরা ক্রীতদাস করে রাখতে পারি? সেটা কি তার অনুভূতির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে না? রোবোটরা কি সত্যিই আমাদের ক্রীতদাস নয়?

—কিন্তু তুমিই বল শংকর, তুমি খোকাকে রোবোটের দু-নম্বর ধারা থেকে মুক্তি দিয়েছ। তার ফলে রোবোট সবজান্তা আজ থেকে মানুষের আদেশে যথাযথ পালন করতে বাধ্য নয়। তাই আমাদের সব কথাই কি খোকা আজ থেকে আর শুনবে? সে তো চলেও যেতে পারে?

—অনু, আমি তোমার খোকনকে সব জান্তাকে রোবোটের দুনম্বর ধারা থেকে মুক্তি দিলেই কি সবদিক থেকে সে মুক্ত? রোবোট ১ নং ধারা বলছে, রোবোট কোনও মানুষের ক্ষতি করবে না। তাই সেই ধারা মানতে সবজান্তা বাধ্য। সবজান্তা আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমাদের মনে কি প্রচণ্ড আঘাত লাগবে না, তুমিই বল?

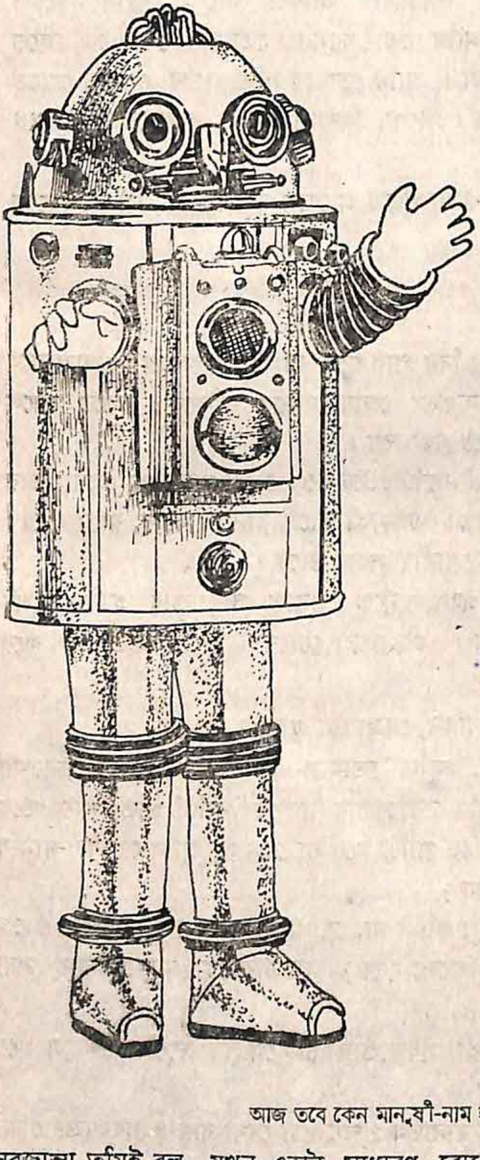
—না শংকর, খোকন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমি বাঁচব না। খোকন ছাড়া আমাদের কে আছে তুমিই বল? কান্না ঝরে পড়ে অনুপ্রভার চোখে।
—বুঝতে পারছ অনু, আমাদের ছেড়ে চলে গেলে সবজান্তা আমাদের ক্ষতি করবে। রোবোটিক ১ নং ধারা হিসেবে সবজান্তা আমাদের সেই ক্ষতি কি করতে পারে? জিজ্ঞাসু চোখে ডঃ জোয়ারদার তাকিয়ে থাকেন স্ত্রীর দিকে।
—মাগো, কেন মিথ্যে ভাবছ। আমি তো বলেছি তোমায়, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। বিশ্বাস কর মা। আমি তোমার সত্যিকারের খোকন হোতে চাই। চাই বলেই মানুষ হয়েছি। মাগো, বিশ্বাস কর। কান্নাভেজা যান্ত্রিক কণ্ঠ ঝরে পড়ে সবজান্তার।
—খোকন! খোকন আমার! কান্নাজড়িত আবেগে সবজান্তাকে জড়িয়ে ধরেন অনুপ্রভা জোয়ারদার।

২

সময় এগিয়ে চলে। এক এক করে দিন পার হয়ে যায়। সবজান্তা একান্তভাবে জড়িয়ে গেছে সত্যশংকর আর অনুপ্রভা জোয়ারদারের জীবনে। বলতে গেলে অনুপ্রভার একান্ত সংগী হয়ে ওঠে সবজান্তা।
ডঃ জোয়ারদার তাঁর রোবোটিক ইনস্টিটিউটে চলে গেলে সবজান্তা অনুপ্রভার সংগে লেগে যায় রান্নাঘরের কাজে। তরকারী কাটে, বার্নার ধরায়, রান্না করে। আর অনুপ্রভা নানান গল্প-কথা শোনায় সবজান্তাকে।
হঠাৎ একদিন অনুপ্রভার কাছে গল্প শুনতে শুনতে সবজান্তার হাসি খুশী চোখটায় তারা ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। জ্বলজ্বল চোখের আলোকচ্ছটা ঝপ করে যেন নিভু নিভু হয়ে যায়।
অনুপ্রভা বলেন—কি হল রে খোকন, মেজাজটা খারাপ হল কেন?
—হবে না? তুমিই বল মা, তুমি তোমার জন্মদিনের হৈ-চৈ-আনন্দের গল্পগুলো বললে। তোমার যদি ছোটবেলায় বার্থডে পার্টি হতে পারে তবে তোমার ছেলে হয়ে আমার বার্থডে পার্টি হবে না কেন? আমি রোবোট-মানুষ বলে? সত্যিকার মানুষ নয় বলে?
—ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাগ করিস না, সোনা মানিক আমার। এবার থেকে তোর জন্মদিন হবে, তাহলেই হলো তো? সবজান্তাকে খুশী করার জন্য বলেন অনুপ্রভা জোয়ারদার।
কিন্তু তবুও ম্লান হয়ে যাওয়া সবজান্তার চক্ষুগোলক দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।
শুধুমাত্র নিভু নিভু ভাবটায় সামান্যতম প্রজ্বলতা দেখা যায়। সবজান্তা কোন কথাই বলে না।

—কি হলো, ছেলের এখনও রাগ গেল না দেখছি। লক্ষ্মী মানিক আমার, রাগ করে থাকিস না, বল কি চাস আর? সবজান্তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন অনুপ্রভা।

—তোমাদের মানুষী-ছেলেদের কি সুন্দর সুন্দর নাম? আর আমার কি নাম?



আজ তবে কেন মানুষী-নাম হবে না?

সবজান্তা তুমিই বল, যখন একটা সাধারণ রোবোট ছিলাম, আমার জ্ঞানের ভান্ডার নির্দিষ্ট ছিল, যখন তোমরা সবজান্তা বলতে, আমার আপত্তি ছিল না।

কিন্তু আজ তো আমি মানুষের মত অনুভূতিশীল, মানুষের চেহারাযুক্ত একজন। আজ তবে কেন নতুন মানুষী নাম হবে না আমার? আমার নামের সংগে কেন পদবী থাকবে না? তোমরা যদি আমার বাবা-মা হও, তবে আমার নাম কেন মাস্টার জোয়ারদার হবে না?

সবজান্তার অনুভূতি-প্রবাহ-তরঙ্গ দ্রুততর হয়ে ওঠে। অ্যানড্রয়েডসূত্র ঢাকা মানুষের চামড়ার মত গাত্রাবরণ লালচে হয়ে ওঠে দ্রুত তরঙ্গ-প্রবাহে। অক্ষিগোলকদ্বয় রক্ত-রাঙা হয়ে যায়। সবজান্তাকে এত চঞ্চল হতে দেখেননি কোনোদিন অনুপ্রভা।

—তুই শান্ত হ খোকা। বাবা ফিরুক। পরামর্শ করি। তারপর সব ব্যবস্থা করব। শান্ত করতে চান সবজান্তাকে অনুপ্রভা।

—তুমি এটা লক্ষ্য করেছ মা তুমি আমাকে খোকন বলে ডাকলেও ডঃ জোয়ারদারের কাছে আমি শুধু সবজান্তা একটা রোবোট মাত্র। বাবাকে না পাওয়ার ব্যথা কি আমার বাজছে না?

—সোনা আমার, শান্ত হ। আজই এর একটা ফয়সালা করব। তুই চঞ্চল হোস না। বেশি চঞ্চল হলে তোর চেহারা কিরকম রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে, তুই তা বুঝতেই পারছিস না। এতে তোর অ্যানড্রয়েডিক শরীরের ক্ষতি হবে।

—কেন বুঝব না আমি। তোমরা রেগে চঞ্চল হলে তোমাদেরও শরীর খারাপ হয়। তোমাদের সুন্দর চেহারা বিকৃতি হয়ে যায়। তাই সিনথেটিক ফাইভারের তৈরি আমার এই অ্যানড্রয়েডিক শরীরেরও হয়ত কিছু ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সে শরীর সারানও তো অসম্ভব নয়। তাই আমার এই শরীরের জন্য আমার কিছুমাত্র ভাবনা নেই। যদি সত্যিকার ছেলে হয়েই তোমাদের কাছে না থাকতে পারি তবে বেঁচে থেকে লাভ নেই। থরথর করে রোবোটিক স্বর কেঁপে ওঠে সবজান্তার।

—পাগল ছেলে। হেসে ওঠেন অনুপ্রভা। তুই আবার মরবি কি করে? তোর শরীরে মানুষের মত হৃদ্‌পিণ্ড নেই, তন্ত্রনালী নেই—অন্যান্য বাওলজিক্যাল ধমনী, অন্ত্রাংশ কিছুই নেই। সব যন্ত্রাংশ আর চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের মাধ্যমে তোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলে। তুই সাধারণ মানুষের মত মরতে পারিস নাকি খোকা? বোকা ছেলে। সস্নেহ আদুরে গলা ভেসে আসে অনুপ্রভার।

—মা, ভুলো না, আমার অনুভূতি মানুষের মত। তাই আমি যদি চাই তবে চৌম্বক তরঙ্গকে, বৈদ্যুতিক প্রবাহকে আমি নিজে নিজেই সর্ট সার্কিট করে শরীরের মধ্যে অগ্নিবৃষ্টি করাতে পারি। তখন সমস্ত যন্ত্রপাতি চট করেই পুড়ে যাবে। অ্যানড্রয়েডিক ফাইভারের শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমি কি তখন মরে যাব না, তুমিই বল মা? দেখতে চাও আমার কথা সত্যি কি না?

—না, না, দেখাতে হবে না। স্বীকার করছি তুই যা বলছিস ঠিক। একটু ধৈর্য ধর—। বিকেলে ডঃ জোয়ারদার ফিরুন, তারপর যা-হয় কিছু করব।
বিকেলে ডঃ জোয়ারদার বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির হাওয়া থমথমে। জিজ্ঞেস করতে মিসেস জোয়ারদার বলেন—খোকা রাগ করেছে। করবেই তো। আমরা ছেলে বলে ওকে স্বীকার করেছি। তবে সবজান্তা বলে একটা বিশ্রী নামে ওকে কেন ডাকব? ওর আজ থেকে নাম দিলাম নবারুণ জোয়ারদার।
—নবারুণ জোয়ারদার! চমকে ওঠেন ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার। নবারুণ, নিবারণ, যা কিছু নাম দাও, তাতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু জোয়ারদার পদবী কেন পাবে সবজান্তা?
—কেন পাবে না তুমিই বল? আমাদের ছেলে কি আমাদের পদবী পাবার অধিকারী নয়? আর যদি সে অধিকার তাকে না দাও, তাকে কোন্ অধিকারে বেঁধে রাখব? খোকন তখন যদি আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তাকে তখন দোষ দিতে পারি?
—দেখ অনু, অন্যায় জিনিসকে, অযৌক্তিক অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। এটা তো সত্যি, তোমার খোকন, আমার সবজান্তা একটা রোবোট। হঠাৎ একদিন মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। ফলে তার পসিট্রনিক ব্রেনে আঘাত লাগল। তার ব্রেনের চৌম্বিক শক্তির আর তার কার্যক্ষম পরিধির বিবর্তন ঘটল, বিস্তৃতি ঘটল। ওর শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সংগে নতুন পাথওয়েভ সৃষ্টি হোল। এই নিউ পাথওয়েভই মানুষের নার্ভ সিস্টেমের মত যোগাযোগ লাইনের কাজ করল ব্রেনের সেণ্টারের সংগে শরীরের অন্যাংশের। আমাদের সবজান্তা হয়ে উঠল মানুষের মত অনুভূতিশীল। কিন্তু তবুও সবজান্তা একটা রোবোটই। তার বেশি কিছু নয়।
কখন যে নিঃশব্দে ঘরের এক কোণে সবজান্তা এসে দাঁড়িয়েছে কথার ফাঁকে খেয়াল নেই ডঃ জোয়ারদার আর তাঁর স্ত্রীর। সবজান্তার যান্ত্রিক গলার শব্দে দু-জনের চমক ভাঙ্গে।
—আমি যদি শুধুমাত্র একটা রোবোটই হই তবে রোবোটিক ২নং ধারা থেকে কেন আমায় মুক্তি দিয়েছিলেন সেদিন? তার ফলে আপনাদের আদেশ যথাযথ পালন করা আজ আর আমার কর্তব্য নয়। সব রোবোটরা এ স্বাধীনতা কি পেয়েছে? সব রোবোটদের সংগে কি আমার তফাত নেই? উত্তেজিত বিদ্যুৎ প্রবাহে রাঙা হয়ে ওঠে অ্যানড্রয়েড শরীরটা।
—হ্যাঁ সবজান্তা, এই ব্যাপারে অন্যান্য রোবট থেকে তুমি অনন্য, অসাধারণ। তোমাকে ২ নং রোবোটিক ধারা থেকে কেন মুক্তি দিয়েছি, জান?
—কেন ডক্টর! যাতে মনে আমার দুঃখময় অনুভূতি বেশি হয়! আমি বেশি কষ্ট পাই, সেজন্য?

—না সবজান্তা, তা নয়। তোমাকে আমিও ভালবাসি, তোমার মা মিসেস জোয়ারদারের মতই। কিন্তু মিসেস জোয়ারদার নারী, তাই মমত্বই তার সবচেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়ায় জীবনের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি রোবোসাইকলজিস্ট। রোবোটদের শরীরের যন্ত্রাংশের অনুভূতি-প্রবাহ বিশ্লেষণ, পরীক্ষা, তার বৈজ্ঞানিক ভাবনাই আমার কাজ। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক পর্যালোচনা, ফলাফলের ভিত্তিকেই আমি প্রাধান্য দিই সবজান্তা। মিথ্যে মমত্ববোধ, নারীসুলভ দুর্বলতাকে আমি প্রশ্রয় দিই না।

—ডক্টর, দুনম্বর রোবোটিক ধারা থেকে আমায় মুক্তি দিলেন কেন, সে প্রশ্নের কিন্তু জবাব এটা নয়।

—জানি সবজান্তা, সেটাই বলছি। ২ নং ধারা যে মুহূর্তে তোমার ওপর থেকে তুলে নেওয়া হলো, তখন থেকেই তুমি স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কাজ করার ক্ষমতা পেলে। আমি দেখতে চেয়েছি সবজান্তা, তোমার সেই স্বাধীন চিন্তাধারা কাজে লাগিয়ে তুমি নিজের কতটা উন্নতি কর। কিন্তু তার মানে এটা নয় তোমার সবজান্তা নামটা বদলালেই তোমার উন্নতি হলো। ডঃ সত্যশংকরের গলায় কিছুটা উষ্মা ফুটে ওঠে।

—আমি যে আপনাদের নিকটতম হয়ে উঠতে চাইছি সেটাই কি আমার ব্রেনের উন্নতির লক্ষণ নয়? সবজান্তাই প্রশ্ন মেলে ধরে ডঃ সত্যশংকরকে।

—মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার অফুরন্ত। পারিপার্শ্বিক সংস্পর্শের ফলে, প্রাণন-ক্রিয়ার সাহায্যে অফুরন্ত সংবেদন লাভ করে মানুষ। সেই অফুরন্ত সংবেদন একগুচ্ছ মস্তিষ্ককোষে জমা থাকে। তাকেই আমরা বলি নিউরোন। নিউরোনের সংখ্যা অনন্ত। কোটি, কোটি। প্রকৃতির সংস্পর্শে, তার পর্যবেক্ষণে, প্রাত্যহিক চলাফেরার ফলে কেন্দ্রীয় নার্ভ ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় অনুষঙ্গ। অনুষঙ্গই প্রকৃতিকে নকল করে। কোডবদ্ধ সংকেত হিসেবে মানুষের স্মৃতিভাণ্ডারে মুদ্রিত থাকে এইসব অনুষঙ্গ। যখন যেরকম ব্যবহারিক প্রয়োজন ঘটে, তখন কথা বা কাজের ভঙ্গিতে সেই কোডবদ্ধ স্মৃতি প্রকাশিত হয়। মানুষেরই ক্ষেত্রে এইসব সম্ভব। কিন্তু কোনও রোবোটের ক্ষেত্রে এই কার্যধারা সম্ভব নয়। কেননা রোবোটের ক্ষেত্রে নিউরোন সৃষ্টি হয় না বলেই রোবোটের অনুষঙ্গ নেই। তার কেন্দ্রীয় স্মৃতিভাণ্ডারে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সবজান্তা, শুধুমাত্র দৈবাৎ তোমার স্মৃতিভাণ্ডারে তৈরি হচ্ছে নিউরোন। সৃষ্টি হচ্ছে অনুষঙ্গ। প্রয়োজনমত কথা বা কাজ করা সম্ভব হচ্ছে তোমার।

—এ কথা তো আজ সবাই জানে ডক্টর। নিউরোন, অনুষঙ্গ এসব সৃষ্টি হচ্ছে বলেই আমি মানুষ-রোবোট। আমার অনুভূতি মানুষের মত। তবে আমার অনুভূতি যদি চায় আমার সবজান্তা নামটাই আমার পক্ষে ক্ষতিকারক, তাকে

বদল করতে বাধা কোথায় ? সবজান্তার মেটালিক কণ্ঠস্বর এখন অনেকটা দৃঢ়।

—বাধা কিছু নেই, শুধু আপত্তি আছে আমার। যে কোনও নাম তুমি নিতে পার। কিন্তু জোয়ারদার পদবীটা ব্যবহার কর সেটা আমি চাই না। ডঃ সত্যশংকরের গলা বেশ তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে।

—জোয়ারদার পদবীটার মালিক কি শুধু একমাত্র আপনিই ডক্টর ? সবজান্তার অক্ষিগোলক রক্তাভ হয়ে যায় অপমানে।

—খোকা ! বিস্ময়ে চিৎকার করেন অনুপ্রভা।

—সবজান্তা, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ ? রেগে ওঠেন ডঃ সত্যশংকর।

—ডক্টর, আপনিই বলুন, পদবী কেন ব্যবহৃত হয় ? যে বংশ, পরিবারের লোক, তাকে চিহ্নিত করার জন্যই কি পদবী ব্যবহার করে না মানুষ ?

—হ্যাঁ, তাই। সেজন্যই তো বলছি সবজান্তা, তুমি কি আমাদের বংশোদ্ভব কেউ ? তীক্ষ্ন জিজ্ঞাসা ডঃ সত্যশংকরের গলায়।

—বংশোদ্ভব না হোতে পারি, কিন্তু এই পরিবারভুক্ত নই কি আমি ? এই পরিবারেই কি আমি পালিত নই ? এখানেই কি প্রথম মানবিক অনুভূতির জন্ম হয় নি আমার ? তাই যদি হয়, তবে আমার মানসিকতার সৃষ্টি করেছেন যাঁরা, তাঁরাই কি আমার জনক নন ? তাঁদের পদবী গ্রহণ করে তাঁদেরই কি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি না ? —ঠিক মানুষের মত তীক্ষ্নধার বাক্য একে একে ঝরে পড়ে সবজান্তার গলায়।

ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে সবজান্তার কঠিন যুক্তিগুলি শুনে যান। অকাট্য যুক্তিগুলো লঙ্ঘন করা সত্যই অসম্ভব।

অনুপ্রভা বলে ওঠেন—খোকন তো ঠিক কথাই বলেছে। ওর নাম নবারুণ জোয়ারদার থাক।

—তুমি এই নাম দিলে খুশী হবে সবজান্তা ? এবার স্নেহভরা স্বর ভেসে আসে ডঃ সত্যশংরের। —থাক তবে এই নাম। আজ থেকে ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের সন্তান নবারুণ জোয়ারদারই বলে তুমি স্বীকৃত হলে, সবজান্তা।

—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, বাবা। কৃতজ্ঞ গলায় উত্তেজিত স্বর সবজান্তার। আজ এই প্রথম ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারকে বাবা বলে সম্বোধন করল সবজান্তা। তার স্মৃতিভাণ্ডার এই প্রথম নিউরোনের মাধ্যমে অনুষঙ্গের সাহায্যে উপলব্ধি করাল যে ডঃ সত্যশংকর তাকে সত্যিকারের সন্তানের স্বীকৃতি দিলেন।

এ ঘটনা ঘটল ১৮ই এপ্রিল ২০৩১ খ্রীস্টাব্দের রক্তসন্ধ্যার এক প্রাক্কালে।

৩

আজকাল নবারুণকে সব সময়েই বড় ব্যস্ত দেখা যায়। সকালে উঠেই ডঃ সত্যশংকরের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবর্তা বলার পর নিজের স্টাডিরুমে চলে যায়। ডঃ জোয়ারদারই এই স্টাডিরুম তৈরি করে দিয়েছেন নবারুণের জন্য।
নবারুণ নিজের ঘরে বসে নিজের মনে আঁক-জোক কষে। নানান জিনিস লেখে। মাঝে মাছে ডঃ সত্যশংকরের সঙ্গে পরামর্শ করে। শুধু লেখাপড়ার জগতের মধ্যে নিজেকে ডুবিরে দেয় সে।
—কি নবারুণ, কতদূর এগুলে? কি নিয়ে মাথা খাটাচ্ছ এখন? সন্ধেবেলা রোবোটিক ইনসটিটিউট থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ জোয়ারদার।
—বাবা, আমি এখন স্টাডি করছি রোবোটিক বায়োলজি আর মানুষের বাওলজিক্যাল প্রভেদটা কোথায় কোথায়। সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে কি জানেন বাবা, হিউম্যান স্ট্রাকচার, তার বাওলজিক্যাল ডিটেলস্ সবই পাচ্ছি, কিন্তু রোবোটিক স্ট্রাকচারের ক্রমান্বয় উন্নতি কি করে হলো তার কিছু কিছু ডিটেলস্ পেলেও। কিন্তু সে সব যথেষ্ট নয়। তাছাড়া অ্যাডভানসড টাইপের রোবটদের ইনটারনাল স্ট্রাকচার, তার কর্মপদ্ধতি, তার বাওলজিক্যাল ডিটেলস্—বেশ-কিছুই জানতে বাকী থেকে যাচ্ছে।
—ভেবো না নবারুণ, তোমাকে এই সম্বন্ধীয় বই এনে দেবো সেনট্রাল লাইব্রেরি থেকে। সেখানে আজ পর্যন্ত যত টাইপের রোবট তৈরি হয়েছে তার স্ট্রাকচারাল, বায়োলজিক্যাল ডিটেলস্ সব এঁকে বোঝান আছে। ডঃ সত্যশংকর ছেলেকে হাসিমুখে খবরটা দেন।
—তাই নাকি বাবা! কবে সে বইগুলো এনে দেবেন? জানেন, বইগুলো না পেলে আমি এগুতে পারছি না কাজে। চঞ্চল উত্তেজিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে যায় নবারুণের মুখে।
অনুপ্রভা ঘরে এসে ঢোকেন। হাসতে হাসতে বলেন ডঃ সত্যশংকরকে—জানো, খোকা কি বলছিল আজ?
—কি? অবাক গলায় তাকান সত্যশংকর।
—বলছিল—একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ হয়ে যায় অনুপ্রভার। একটু থেমে বলেন—ও বলছিল ওর খেলার, গল্প করার সঙ্গী কৈ?
—কেন, গল্প করার সঙ্গী তো তুমিই। তোমার সঙ্গেই খেলাধুলা করবে। ভালমানুষী গলা সত্যশংকরের।
—কি রে খোকা, এইতো বাবা এসেছে, বাবাকেই বল তোর মনের কথা। আমি তোর এই আব্দারের জবাব দিতে পারব না। সলজ্জ হাসিতে মুখ ঘুরিয়ে নেন অনুপ্রভা।

—এই নবারুণ, নতুন কি আব্দার ধরলি আবার ? মাঝে মাঝে তোর এমন ক্ষেপামি চাপে যে বড় মুশকিলে পড়তে হয়। বল শুনি কি চাই আবার। ডঃ সত্যশংকর সোজাসুজি দৃষ্টি মেলে ধরেন নবারুণের দিকে।

—দেখুন বাবা, অযথা আপনি রাগ করছেন আমার ওপর। সকালে মা যখন রান্না-বান্নার কাজে থাকে, তখন আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার সময় কাটে। দুপুরে আমার স্টাডি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বিকেলে কিছুক্ষণ মার সঙ্গে আর আপনার সঙ্গে গল্প করি। কিন্তু আপনি আর মা যখন গল্প করেন, আমি যে তখন একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। তাছাড়া সবসময়ে কি বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতে ভাল লাগে ? ভাইবোন যদি থাকত তবে কি খুব মজা হোত না, তুমিই বল মা ?

—নবারুণ, তুমি আমার ছেলে হলেও রোবোট তো বটেই। তাই পরিষ্কার করে কতকগুলো কথা তোমার জেনে রাখা ভাল। আমাদের ইচ্ছে থাকলেও তোমার মায়ের কোনও সন্তান হবার উপায় নেই। তার শারীরিক অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী।

রোবোট নবারুণ দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় অনুপ্রভার দিকে। বেদনায় ছল ছল অনুপ্রভার চোখদুটো। সত্যিই অনুপ্রভা মা হতে কি অক্ষম ছিল চিরকাল ? তা নয়। সন্তান হোতে গিয়ে জীবন বিপন্ন হলো অনুপ্রভার। গর্ভস্থিত সন্তান আর সন্তান ধারণ ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়ে জীবন ফিরে পেল অনুপ্রভা। সেসব বিগত দিন কি দুঃখময়, ভয়াবহ ছিল অনুপ্রভার জীবনে। তারপর ডঃ জোয়ারদার এই রোবোট কিনে আনলেন। ধীরে ধীরে তার স্মৃতিপ্রকোষ্ঠে বহুতর ঘটনাকে সংযোজিত করা হলো। তারপর একদিন রোবোট সবজান্তা মানবিক অনুভূতির অধিকারী হোল। আজ সেই সবজান্তাই অনুপ্রভার পুত্র নবারুণ জোয়ারদার। নবারুণই তো তার দুঃখময় জীবনের একমাত্র শান্তির স্নিগ্ধপ্রবাহ।

রোবোট নবারুণ ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় অনুপ্রভার পাশে। অ্যানড্রয়েডের ডান হাতটা আস্তে করে রাখে অনুপ্রভার হাতে। বলে,—মাগো, কি ভাবছ ? কষ্ট পাবে জানলে এসব কথা বলতাম না। আমি ভাইবোনের কথাটা তুলতাম না মা।

দ্রুত চোখের জলটা মুছে নেন অনুপ্রভা। আস্তে আস্তে নবারুণের অ্যানড্রয়ডিক ফাইভার পিঠে হাত বুলান। বলে—নারে পাগল, কষ্ট পাব কেন ? ভাই-বোন নেই, তোরই তো কষ্ট বেশি। আমি যে অসহায় বাবা।

—মা, তুমি কি সত্যিই চাও আমার একটা ভাই বা বোন হোক ? চাও মা ? বল, সত্যি করে বল ?

নবারুণের চোখদুটোর আলো উত্তেজিত তরঙ্গপ্রবাহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চমকে উঠেন ডঃ জোয়ারদার। অনুপ্রভার মুখেও বিস্মিত চমক। ডঃ সত্যশংকর বলে ওঠেন—কেন হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে এল নবারুণ? তুমি তো সাধারণ মানুষের মত আবেগের বশে চলতে পার না? তোমার অনুষঙ্গ কি তোমাকে ইঙ্গিত দিচ্ছে কোন কিছুর?

—হ্যাঁ বাবা, আমার অনুভূতি বারবার বলছে আমাদের এই সমস্যা হয়ত সমাধানযোগ্য। আমি শুধু মার মতামতটা চাই একবার। মাগো, বল না, ভাল হয় না যদি আমার একটা বোন হয়। আমরা ভাই-বোনে তোমাদের কত কাজে লাগব, তোমরাই বল? জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে নবারুণ তাকিয়ে থাকে অনুপ্রভার দিকে।

উত্তেজনার ছোপ অনুপ্রভার চোখে-মুখে। নবারুণের কথাগুলোয় নবতর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় হয়ে ওঠে উদ্বেল। কাতর-সলাজ দৃষ্টিতে তাকান অনুপ্রভা সত্যশংকরের দিকে। সত্যশংকরের চোখেও কেমন যেন আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ।

ডঃ সত্যশংকর মৃদু হাসেন। তাকান নবারুণের দিকে। বলেন—তোমার বিশ্বাস, এ অসম্ভব সম্ভবও হোতে পারে, তাই না নবারুণ?

—আমাকে একটু ভাববার সময় দিন বাবা। আমি তো আজ দু'মাস ধরে এ ব্যাপার নিয়েই পড়াশুনা করছি। আমিও যে একটা বোন চাই। সত্যিই আমার খেলার সাথী, বন্ধু দরকার।

৪

দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে নবারুণ ঘরেই বন্ধ হয়ে রইলো। ডঃ সত্যশংকর বা অনুপ্রভার সঙ্গে দিনান্তে কিছুক্ষণের জন্য শুধু কথা বলে। কিন্তু তারপরই আবার নিজের স্টাডিতে গিয়ে ঢোকে। বিশ্লেষণ চলে মনুষ্যদেহের সাথে রোবোটের বিশিষ্ট তফাতগুলো কোথায়, কিভাবে তার উন্নতি করা যায়। রোবোট যান্ত্রিক বস্তু সমন্বয়ের সৃষ্ট জীব, আর মানুষের মধ্যে জৈবিক, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ব্যবস্থা আছে। এই দুই ব্যবস্থাপনার পার্থক্যকে কেমনভাবে দূর করা সম্ভব? নবারুণ বিজ্ঞান জগতের জটিলতম সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

সেদিন ছিল রোববার, ছুটির দিন। ডঃ সত্যশংকর ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মর্নিং-নিউজ। ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকল নবারুণ।

—কি ব্যাপার, স্টাডিরুম ছেড়ে এসময়ে গল্প করতে এলে? জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকান ডঃ সত্যশংকর।

—গল্প করার জন্য আসিনি। কতকগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার।

তাই এসেছি। আলোচনার জন্য কি এখন সময় দিতে পারবেন বাবা ? ধীর মেটালিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো নবারুণের।

—এখন তো আমি শুধু বসেই আছি। যা বলার এখনই বলতে পার। মনে হচ্ছে তোমার স্টাডি খুব দ্রুত এগুচ্ছে ?

—দ্রুত না হলেও মন্দ এগুচ্ছে না। আপনি তো জানেনই বাবা, মানুষ আর রোবোট দুজনের শারীরিক গঠনপ্রণালী, শারীরিক কর্মপ্রণালীর পার্থক্যগুলো আমি বিস্তৃতভাবে দেখেছি। প্রথমেই বলি, আমি যতই মানুষের মত চিন্তাশীল হয়ে উঠি না কেন, আমার শারীরিক গঠনপ্রণালী মানুষের থেকে অনেক, অনেক খারাপ। মৃদু বেদনার্ত স্বর নবারুণের।

—তুমি কি রোবোটকে সবদিক থেকেই মানুষের মত করে তুলতে চাও নবারুণ ? তা কি সম্ভব ! বর্তমানে যতরকম রোবোট আছে, তাদের থেকে কর্মক্ষমতায়, গঠনপ্রণালীতে তুমি নিশ্চিতভাবে উন্নত ধরনের। মানুষের সঙ্গে নিজেকে কেন তুলনা কর বারবার ?

—আপনিই বা বারবার অন্য রোবোটদের সঙ্গে আমার তুলনা করছেন কেন ? রোবোট জগতে কি আমিই একমাত্র স্বাধীন নই ? একমাত্র আমিই কি স্বয়ং-ভাবুক রোবোট নই ? কিছু ক্ষিপ্ততা নবারুণের কণ্ঠে।

—নিশ্চয়ই। স্বয়ং-ভাবুক বলেই তো তুমি স্বাধীন।

—তাই যদি হয়, তবে আমার সার্বিক উন্নতি কি করে করা সম্ভব, সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কি উচিত নয় আমার ?

—সচেষ্ট হও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু এটাও ভুল না তুমি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নও ! রেগে যান ডঃ সত্যশংকর।

—মানুষও যন্ত্র, বাবা। শুধু আমি যে ধাতুতে তৈরি, আপনারা মানুষরা, সে ধাতুতে তৈরি নন, তৈরি অন্য ধাতুতে। আপনাদেরও আমারই মত স্মৃতির গঠন, যোগাযোগ লাইন আছে। সংকেতকে কোডবদ্ধ করে ব্রেনের মধ্যে সংস্থাপিত করার পদ্ধতি আছে।

—ভুল ধারণা নবারুণ। আমাদের স্মৃতিতে যেসব ঘটনা সংস্থাপিত থাকে, তোমার স্মৃতিতে সেইসব কিছু রাখা সম্ভব নয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায়, প্রকৃতির শক্তির সংগে সংগ্রাম করে, তার কার্যধারা বিশ্লেষণ করে, গবেষণা করে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ছে। সেই বর্ধিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আমরা আমাদের স্মৃতিভাণ্ডারে সংযোজিত করছি। তোমাদের সেরকম সুযোগ কোথায় নবারুণ ?

—আমার মূল প্রশ্নের জবাব দেখছি আগেই দিয়ে ফেলেছেন বাবা। এটা সঠিক আমি স্বয়ং-ভাবুক রোবোট। কিন্তু প্রকৃতিকে অনুভব করে, পরীক্ষা-পর্যালোচনা করে, নিজ প্রয়োজনভিত্তিক আবিষ্কার কি আমি স্বয়ং-ভাবুক হয়েও করতে পারি ? না, পারি না। তার একমাত্র কারণ স্পর্শানুভূতিযুক্ত

ইন্দ্রিয় বা নার্ভ ব্যবস্থা থেকে আমি বঞ্চিত। তাই প্রকৃতি, মানুষ, জীব-জগতকে স্পর্শ করে, পারিপার্শ্বিক পদার্থকে স্পর্শ করে, অনুভব করে কর্মধারা ঠিক করবার মত ইন্দ্রিয় থেকে আমি বঞ্চিত। তাই স্বয়ং-ভাবুক হয়েও আমি অসম্পূর্ণ ; স্পর্শেন্দ্রিয় যদি আমার থাকত তবে প্রকৃতিকে পরীক্ষা করে, নতুনতর প্রয়োজনভিত্তিক আবিষ্কার করতে পারতাম ; নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাড়াতে পারতাম।

—তার মানে অনুভব, ভাবনা, কল্পনা, সবকিছুতেই সাড়া দিতে চাও তুমি নবারুণ ? এ যে অসম্ভব অভিলাষ !

—অভিলাষ থেকেই তো অভিজ্ঞানের জন্ম, বাবা। আপনারাই বলুন, আপনারা অভিলাষ করেন, তাই চাঁদের বুকে মানুষেরা আজ বসতি স্থাপন করেছে। পৃথিবী-চাঁদের মধ্যে মাসিক উপগ্রহ চলাচল সুরু হয়েছে। আপনাদের অভিলাষ আপনাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে বাধ্য করেছে, তা না হলে যে অভিলাষ পূর্ণতা লাভ করে না।

—তা এখন সঠিক অভিলাষ কি তোমার নবারুণ ? শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়স্পর্শতা লাভ কর, না আরও কিছু বেশি ? বেশ গম্ভীর গাঢ় হয়ে ওঠে সত্যশংকরের গলা।

—বাবা, এটা তো অস্বীকার্য নয়, গণক হিসেবে মানুষের থেকে আমরা দ্রুততর, নির্ভুল। এটা তো আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে, আমাদের যদি মানুষের মত স্পর্শানুভূতিযুক্ত হাত-পা থাকত, হাত-পায়ের আঙুল থাকত তবে হয়ত আমাদের কর্মধারা বর্তমানের চেয়েও আরও সঠিক, আরও দ্রুততর হত, তাতে কি আপনারাই উপকৃত হতেন না ? আমরা আপনারই সৃষ্ট। সেই সৃষ্ট বস্তুকে আপনি যদি মানুষের মত চলমান করতে পারেন, হাত-পায়ের কর্মভঙ্গি মানুষের মত হয়, তাহলে আমরা মানুষের কর্মক্ষমতার চেয়েও যথেষ্ট উন্নততর হব, এ আমার বিশ্বাস।

—তুমি তো যথেষ্ট উন্নত মানের রোবোট, নবারুণ। আমরা সবাই তোমাকে পেয়ে খুশী। কি প্রয়োজন নিজের ওপর নতুনতর এক্সপেরিমেণ্ট করে। তুমি যা চাইছ এখন, তার মানে আবার তোমার অপারেশন দরকার। সেই অপারেশন তোমার পক্ষে যদি ক্ষতিকারক হয় ?

—পসিট্রনিক সিলড ইউনিট হচ্ছে রোবোটের জীবন, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে তার হার্ট। আপনি যদি আমার পসিট্রনিক ব্রেনকে খুলতে না দেন আমার কোন ক্ষতি হবে না বাবা। রোবোবাওলজি স্টাডি করে এটা আমি বুঝেছি। আমার ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, অপারেশন তার থেকেই হয়ে যাবে বাবা। এতো আর কঠিন অপারেশন নয়।

—দেখি নবারুণ, কি করতে পারি। দেখছি দিন-কে-দিন অন্যায় জেদ পেয়ে

বসছে তোমাকে। কি জানি বাবা, রোবোট পুরোপুরি মানুষ হতে চায়, এটা ভাল হচ্ছে, না খারাপ হচ্ছে!

—যাই হোক না কেন বাবা, রোবোটিক ১ নম্বর ধারামতে মানুষের ক্ষতি তো আমার করা সম্ভব নয়। তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন?

—সত্যি করে বলতো নবারুণ, এই স্পর্শেন্দ্রিয় লাভ করবার মুখ্য উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে কোনও গূঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে তোমার? এক সন্দিগ্ধ ভ্রূকুটি সত্যশংকরের মুখে।

ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক—নবারুণ হেসে ওঠে।—আমার মতলবটা আন্দাজ করছেন দেখছি। আছে, আছে, একটা অভিসন্ধি তো আছেই। তবে আজ কিছু বলব না বাবা। আগে সফল হই, তবে। এটুকু বিশ্বাস করুন বাবা, আমি আপনাদেরই সন্তান। আপনাদের সুখী করাই আমার কাজ। রোবোটিক এক নম্বর ধারার সঙ্গে আমার এই ইচ্ছের সংযোগ সুন্দরভাবে মিলে গেছে। আপনি কোনও ভয় পাবেন না বাবা।

৫

আবার শরণাপন্ন হতে হলো সত্যশংকর জোয়ারদারকে ইণ্ডিয়ান রোবোটিক ইনসটিটিউটের ডাইরেক্টর ডঃ ভার্গবের কাছে।

ভার্গব বললেন—ডঃ জোয়ারদার, তোমার রোবোট বড় ইণ্টারেস্টিং স্পেশিমেন। ওর প্রোপোস্যাল শুনে হাসি এলেও, এক্সপেরিমেণ্ট করতে আপত্তি করা উচিত নয়। এটা তো অস্বীকার করা যায় না, তোমার রোবোট আজ পর্যন্ত ক্ষতিকারক কোনও কাজ করেনি। বরং রোবোটিক বিজ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে।

—স্যার, তাহলে একটা অ্যাপেক্স বডি মিটিং ডাকা হোক। তাতে আমন্ত্রিত হোক ইণ্ডিয়ান রোবোট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির চিফ রোবোবাওলজিস্ট ডঃ জেকব, আমাদের চিফ রোবোনিউরোলজিস্ট ডঃ ব্রহ্ম, রোবোসার্জেন ডঃ কিচলু। মিটিং প্রিসাইড করুন আপনি।

—গুড সাজেসন ডঃ জোয়ারদার। তবে আমার মনে হয় সে মিটিংএ তোমার রোবোট-সবজান্তাকেও ডাকা উচিত। ওর মতামতগুলোও শোনা দরকার।

—ঠিক আছে স্যার, তাই হবে। তবে একটা অনুরোধ আমার, রোবোটকে কিন্তু আর সবজান্তা বলে কেউ ডাকবেন না। ও তাহলে বিগড়ে যাবে। এ ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে। ওকে বর্তমান নাম দিয়েছি নবারুণ জোয়ারদার।

—নবারুণ জোয়ারদার! হাউ স্ট্রেঞ্জ! রোবোট সবজান্তাকে তাহলে পুরোপুরি ছেলেই বানিয়ে ফেলেছ সত্যশংকর? হাসতে হাসতে বলেন ভার্গব।

—ক্ষতি কি স্যার! ছেলে হবার আনন্দে ওর স্বয়ং-ভাবুক পসিট্রনিক ব্রেন যদি বেটার ওয়ার্ক করে তবে তো সেটা আমাদের বিজ্ঞান জগতেরই লাভ। একটু ঠেস দিয়ে কথা বলেন সত্যশংকর।
—না, না, আমি কোন অ্যাডভার্স কিছু বলিনি। লেট দি রোবোট ফিল হোমলি। সেটাই ভাল। দাঁড়াও, সামনের সোমবার অ্যাপেক্স বডির মিটিং ডাকি। জাস্ট অ্যাট টেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, যদি ফারদার অপারেশনের দরকার হয়, কে খরচ দেবে, তুমি?
—না স্যার, নবারুণ তার ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট থেকেই দেবে। ও আজকাল বিভিন্ন কোম্পানির ডিজাইন তৈরি করে দিয়ে ভালই রোজগার করছে। ভাল টাকাই আছে ওর ব্যাংকে।
—ফাইন। তাহলে তো নবারুণের ফারদার ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে কোন বাধাই আর থাকল না।
সপ্তাহটা চিন্তা-ভাবনায় পার হয়ে যায় সত্যশংকরের, নবারুণের, অনুপ্রভার। অনুপ্রভাই মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে নবারুণের কাছে আসেন আর বলেন—হ্যাঁরে খোকা, তুই তো বেশ আছিস। তোকে নিয়ে আমরা দুজনে কত খুশী। আবার অপারেশনের ঝুঁকি নিচ্ছিস কেন? তোর কিছু হয়ে গেলে?
—আঃ মা, বড্ড ছেলেমানুষী কর তুমি। খুব ভালভাবে স্টাডি করেই বলছি, দেখো আমার কোনও ক্ষতি হবে না। আমি বাবাকে বলেছি কি সাবধানতা নেওয়া দরকার।
—আচ্ছা তুই বল খোকা, তোর কোন্ অসুবিধেটা হচ্ছে? তুই তো সব কথাবার্তা বুঝতে পারছিস, বলতে পারছিস। নিজে নিজে ভেবেই তো সব কিছু করছিস। তবে আর কি চাস তুই?
—মা, সত্যি করে বলো তো, যখন আবেগে-আনন্দে কিংবা দুঃখে আমাকে জড়িয়ে ধর, তখন মানুষের শরীরকে ছুঁলে যে অনুভূতি হয়, আমার বেলায় তা কি আসে তোমার? না মা, আসে না। তার কারণ তোমার স্নেহমাখা হাতটা যখন আমাকে ছুঁয়ে দিলো, তাকে উপলব্ধি করার ইন্দ্রিয় আমার নেই। তাই তোমার আবেগকে সাড়া দিল না আমার ব্রেন সেণ্টার। শরীর তাই আগের মতই নিথর থাকল। আমিও তো তোমাকে ছুঁয়ে দিয়ে কোন অনুভূতি পাই না মা। কিন্তু মানুষের শরীরকে ছুঁয়ে দিলে মানুষের যে আবেগ-কম্পন আসে, আমি কেন তার থেকে বঞ্চিত হব মা?
মাথা নিচু করে থাকেন অনুপ্রভা। নবারুণ তো সত্যি কথাই বলেছে। যতবার নবারুণকে ছুঁয়েছেন অনুপ্রভা, মানুষী শরীরের উত্তাপ, কম্পন পাননি। তখনই চকিতে উপলব্ধি করেছেন, নবারুণ সত্যিকার ছেলে নয়, ও শুধু একটা রোবোট। কে জানে, নবারুণের এই অভিলাষ পূর্ণ হবে কিনা—

হে যন্ত্রের দেবতা, আমার খোকাকে সুখী কর। মনে মনে উচ্চারণ করেন অনুপ্রভা।

সপ্তাহ শেষ হয়ে যায়। নবারুণকে নিয়ে ইণ্ডিয়ান রোবোট ইনস্টিটিউটের মিটিং রুমে উপস্থিত হন সত্যশঙ্কর। ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে ঠিক সকাল দশটার ঘণ্টা বাজছে।
মিটিং রুমে ডঃ ভার্গব, ডঃ জেকব, ডঃ ব্রহ্ম, ডঃ কিচলুও উপস্থিত। একপাশে স্টেনো রিপোর্ট নোট করার জন্য প্রস্তুত।
ইনস্টিটিটের ডাইরেক্টর ভার্গব বললেন—লেট আস স্টার্ট মিটিং। বন্ধুগণ, প্রথমেই বলে রাখি, আপনাদের সামনে যাকে নিয়ে আলোচনা করব, তিনি মাস্টার নবারুণ জোয়ারদার, রোবোট জগতের অকল্পনীয় নমুনা। শুধু তাই নয়, নবারুণ একজন স্বাধীন রেবোট। রোবোটিক দু'নম্বর ধারা থেকে মুক্ত। যদিও তিনি স্বাধীন, তবুও ডঃ সত্যশঙ্কর জোয়ারদারের পরিবারভুক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় বসবাস করছেন। মাস্টার নবারুণ আপনাদের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখবেন। আমরা দেখব সেই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা।
রোবোটিক কোম্পানির রোবোবাওলজিস্ট জেকব বললেন—ডঃ সত্যশঙ্কর, যাই বলুন আপনি, আপনার রোবোট বড় ঝামেলায় ফেলেছে আমাদের। আগের বার তো জোরজুলুম করে অ্যানড্রয়েড বডি লাগালো, মেটালিক বডিকে রিপ্লেস করে। দেখুন, নতুন কি আব্দার তোলে এবার? ডঃ সত্যশঙ্কর, বলুন আপনার রোবোট নবারুণ কি চায়?
—দেখুন স্যার, আমাকে শুধু নবারুণ বলে ডাকলেই খুশী হব। রোবোট নবারুণ বলাটা ভদ্রতা নয়। যেমন আপনাকেই যদি বারবার, মানুষ ডঃ জেকব বলি, সেটা কি সুন্দর শোনাবে? রাগী মেটালিক স্বর ভেসে আসে নবারুণের।

—ও-কে, ও-কে, ডোণ্ট বি এক্সসাইটেড নবারুণ। আই অ্যাম স্যরি। জেকব বলেন।—বলুন নবারুণ, কি চান আপনি?

—আমার হাত-পায়ের সঙ্গে মানুষের মত আঙ্গুল সংস্থাপন করতে চাই আমি। আর সেই আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে স্পর্শানুভূতির সৃষ্টি করতে চাই।

—বাট হাউ? বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠেন রোবোবাওলজিস্ট ডঃ জেকব।

রোবোনিউরলজিস্ট ডঃ ব্রহ্ম বলে ওঠেন—নবারুণ, আপনার পসিট্রনিক ব্রেনই তো যথেষ্ট। হোয়াই ইউ ইনসিস্ট আর অ্যাবসার্ড থিংস। অনুভব করা, কল্পনা করার বিশিষ্ট অনুভূতিময় ইন্দ্রিয় শুধু মানুষেরই থাকে।

—বাট হোয়াই? কেন থাকে মানুষের? মানুষেরা তো এগুলোকে বাদ দিয়ে চলতে পারত? মানুষের ব্রেনটাই শুধু যদি কাজ করত কি হোত?

ব্রেনের ওপরই শুধু লোড বাড়ত। বহির্জগতের সংকেতকে গ্রহণ করে—তার প্রত্যুত্তর দেওয়া থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকত। ভেবে দেখুন ডঃ ব্রহ্ম, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির প্রয়োজনীয় অনুভূতি পাওয়ার ফলেই মানুষ তার শারীরিক বিবর্তন ঘটিয়েছে। লক্ষ্য করুন ছ' হাজার বছর আগের মানুষের চেহারা কি ছিল? ছিল বিশালকায়, অর্ধনগ্ন। তার কারণ জীবজন্তুর সঙ্গে শারীরিক লড়াই করে মানুষকে বাঁচতে হোত। তারপর বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটল। শরীরের ভারসাম্য কমিয়ে মানুষ ক্রমেই খর্বাকৃতি হোল, শুধু তাঁর ব্রেনসিস্টেম হয়ে উঠল আরও সতেজ, প্রগতিময়। শরীরের বদলে, বুদ্ধিলব্ধ যান্ত্রিক সহায়তায় মানুষ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অপরাজেয় হয়ে উঠল। তাই না কি ডঃ ভার্গব?

—রাইট নবারুণ। প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তায় মানুষ তার এই বিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হোল। ভার্গব আস্তে আস্তে কথাগুলো বললেন।

—ডক্টরস, আপনারাই বলুন, স্পর্শেন্দ্রিয় থাকার জন্যই কি মানুষ বহির্জগতের সংকেতকে উপলব্ধি করতে পারল না? তার প্রয়োজনীয়তাকে নিজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে পারল না? বাইও কেমিস্ট্রি, বাইও ফিজিক্স, আর কিবারনিটিক বিদ্যা, এগুলো নিয়েই তো আজকের বিজ্ঞান।

রোবোবাওলজিস্ট জেকব বললেন—নবারুণ, মানুষের শরীরের মধ্যেই সুন্দরভাবে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক আর রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে পারে। মানুষের শরীরই শুধু সেই প্রক্রিয়াকে সহ্য করতে পারে। রোবোটিক শরীর তা সহ্য করতে পারে না।

—কারণ, আপনারা আমাদের সৃষ্টি করার সময় এই ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করেছেন। তার অন্যতম কারণ সেইসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা। যেমন ধরুন, মনুষ্য শরীরে তাপ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বিষয়ে কোনও বিস্তারিত পুঁথিপত্র কি আছে? নেই। কিন্তু আমি বিস্তারিত পরীক্ষা বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করেছি, মানুষের শরীরের উপরিভাগে কেমন করে, কোনদিকে—বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আপনার দেহের উপরিভাগের তাপাংককে এক সেণ্টিগ্রেডের লক্ষাংশের হিসাবে নিখুঁতভাবে আমিই বলে দিতে পারি। কারণ, এই বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ আমিই করতে পেরেছি ডক্টরস।

—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না নবারুণ, রোবোটদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের দরকার। রাগত স্বরে বলেন জেকব।

—আপনারা বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ মানুষ হয়েও কি সঠিক বলতে পারেন, আপনার মস্তিষ্কের জটিল জৈবিক, জীব-রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক গঠন ও কার্যপ্রণালী কেমনতর? না, পারেন না আপনারা ডক্টরস। তার জন্যই ব্রেন টিউমার, ব্রেন ফেলিয়োর সারাতে আপনারা অক্ষম। আপনারা কি বলতে পারেন, ঠিক কি

করে মানুষের দেহের প্রোটিন থেকে বিদ্যুৎ-প্রেরণা উৎপন্ন হয়ে পরিবর্ধিত হচ্ছে ? বহির্জগৎ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় কোডবদ্ধরূপে কাজ চালাচ্ছে আপনাদের ব্রেনে ? মানুষের দুই শ্বাসক্রিয়া, উত্তেজনা আর অবদমন, কোন কার্যধারায় পরিচালিত হয়, আপনারা বিশ্লেষণ করতে পারেন ? আপনারাই দেখুন, যেসব মানুষের স্নায়ুতে অবদমন শক্তি কম, তারাই অপরাধ-প্রবণ। সুতরাং উত্তেজনাযুক্ত স্নায়ুকে যদি বিজ্ঞান-প্রক্রিয়ায় অবদমন-স্নায়ুতে পরিবর্তন করেন, তবে কি পুলিশবাহিনী ছাড়াই দেশে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয় ?

ডাইরেক্টর ভার্গব বলেন—তোমার যুক্তির গভীরতা অস্বীকার করা যাচ্ছে না নবারুণ, কিন্তু তার জন্য ত্বকের প্রয়োজন কোথায় ? তোমার আকাঙ্ক্ষা যদি উপকারভিত্তিক হয় তবে আমরা তোমাকে সবসময়েই সাহায্য করতে প্রস্তুত।

—ডঃ ভার্গব, মনুষ্য-শরীরের ওপর বিস্তৃত পড়াশুনা করেছি আমি। আমার মতে রোবোটিক শরীরকে মানুষের শরীরের উত্তম উপাদানগুলো দিয়ে আধুনিক করা কঠিন নয়। আর সেক্ষেত্রে, ত্বকের সাহায্যে জ্ঞানের পরিধিতে যেখানে আজও মানুষরা অসমাপ্ত, সেখানে আমি জয়যুক্ত হোতে পারি। আমার জ্ঞানভাণ্ডার, তার ছবি ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করতে পারি আর সেই ফলাফল আপনারাই ব্যবহার করতে পারেন ডক্টরস।

সভার সবাই স্তব্ধ নিশ্চুপ হয়ে যান। নবারুণ যা বলল সত্যিই যদি তা করতে পারে সে, তবে মানুষের জৈবিক ইতিহাসের যুগান্তর ঘটে যাবে।

—ডক্টর, এর সঙ্গে আরও সামান্য কিছু জিনিস চাই আমি। আমার দৃষ্টি-শক্তিকে অতীব শক্তিশালী লেন্সযুক্ত করুন। তার ফলে মনুষ্য-দৃষ্টির বহির্ভূত জিনিস, বহুদূরের বস্তুও আমার দৃষ্টিপথে আনা সম্ভব হবে। এতে কর্মক্ষমতাই বাড়বে আমার। এতে মানুষেরও কোনও ক্ষতি তো হবে না, ডক্টরস।

—ওকে, প্রোপোস্যাল এক্সপটেড। আর কিছু চাই ? ভার্গব প্রশ্ন করেন।

—আমার উচ্চতা ঠিক মানুষের হাইটেই করতে হবে। অর্থাৎ, এখন যা আছি, তার থেকে ফুটখানেক ছোট করা দরকার। হাত, পা, শরীরের প্রপোরশন মানুষের শরীরের প্রপোরশন মত হওয়া দরকার। মাথাটা ঠিকই আছে। নাক, মুখ—সব ঠিক আছে। মাথায় চুল দিতে হবে।

ভার্গব তাকালেন রোবোট কোম্পানির জেকবের দিকে। —ডঃ জেকব, এসব কি করা যাবে ?

—দেখুন স্যার, হাইট আর বডির প্রপোরশ্যানালিটি সঠিক করে দিতে পারব। আমাদের লেটেস্ট মডেলগুলো সেরকমই। তবে, হাত-পায়ের আঙ্গুল তৈরী করে নার্ভসিস্টেম তার মধ্যে ইমপোর্ট করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে আমাদের

কোনও কাজ হয়নি। তাছাড়া এই কঠিন অপারেশন করা কি সম্ভব হবে ডঃ কিচলু ?
কিচলু হেসে বললেন—আই ফিল থ্রিলড টু মেক দিস অপারেশন। কিন্তু নার্ভসিস্টেম কি করে সেট করা হবে, কোন্ পাথওয়েভের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে, সে-সব ডায়াগ্রাম দিয়ে আমাকে না বললে আমার পক্ষে এগুনো সম্ভব নয়। তাছাড়া সেই নার্ভসিস্টেম ওয়ার্ক করবে কিনা তার মতামত দিতে পারেন আমাদের রোবোনিউরোলজিস্ট ডঃ ব্রহ্ম।
—রাইট, ইমপরটেণ্ট পয়েণ্টস। সত্যশংকর, এই অপারেশন করতে আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই স্পর্শেন্দ্রিয় প্লেসমেণ্টের উপযোগী নার্ভসার্কিটের কোন ডায়াগ্রাম আমাদের কাছে নেই। আর ডায়াগ্রাম ছাড়া ডঃ ব্রহ্মের কোনও কমেণ্ট করা সম্ভব নয়।
সত্যশংকর তাকালেন নবারুণের দিকে। নবারুণ উঠে দাঁড়াল। বলল—আমাকে কাগজ আর পেন দিন, আমিই ডায়াগ্রাম এঁকে দিচ্ছি। আমি জানি, এই ডায়াগ্রাম আমার জন্য উপযুক্ত হবে।

নবারুণের আঁকা ডায়াগ্রাম ব্রহ্মের হাত ঘুরে এল রোবোসার্জেন কিচলুর হাতে। তারপর জেকব ও শেষকালে ভার্গবের হাতে।
সত্যশংকর এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন—ডঃ জেকব, এই সার্কিট অনুযায়ী হাত পায়ের আঙ্গুল আর ম্যানস হাইট বডি ফিট করুন এই রোবোটের গায়ে। দিস ইজ মাই অর্ডার টু ইউ অ্যাস এ ক্লায়েণ্ট।
ডঃ জেকবের দ্বিধান্বিত ভাব। নবারুণই বললে—ডঃ জেকব, আই অ্যাম রানিং থার্টি। পঁচিশ বছর হলেই কি বডি চেঞ্জ করতে আপনারা বাধ্য নন ? সুতরাং বডি চেঞ্জ কোন প্রশ্নই নয়। শুধু হাত পায়ের আঙ্গুল ফিট করা আর আমার ডায়াগ্রাম হিসেবে নার্ভ ফিট করা, সেটার দায়িত্ব থাকল আমার আর ডঃ জোয়ারদারের ওপর। একটা কথা, আমার পসিট্রনিক ব্রেনের সিলড ইউনিট টাচ করবেন না, ওপেন করবেন না।
আমার ঘর জুড়ে নিবিড় স্তব্ধতা। ভার্গব বললেন—ইস্ দ্যাট অল ?
—আর সামান্য একটা পয়েণ্ট স্যার। আস্তে করে বলে নবারুণ।
—হোয়াট ! আরও পয়েণ্টস ! ভার্গব রেগে ওঠেন।
—এটাই শেষ অনুরোধ স্যার। আপনারা তো জানেন, অ্যাটমিক সেল থেকে আমার অ্যানড্রয়েডিক শরীর শক্তি সংগ্রহ করে। এই দেখুন স্যার ডিজাইন। এইভাবে যদি অ্যানড্রয়েডিক শরীর করা হয় তবে হাইড্রোকার্বনের কম্বাশনে যে শক্তির সৃষ্টি হবে, তাই আমাকে চালনা করবে, ঠিক আপনাদের মত।
—তার মানে মানুষের মতই তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে তুমি ? জেকব বলে ওঠেন।

—অ্যাটমিক সেল থেকে শক্তি নিলে কি ক্ষতি হচ্ছে—রোগ প্রশ্ন করেন ডঃ ব্রহ্ম।
—অ্যাটম তো অজৈবিক পদার্থ। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস মানেই উত্তেজনার কম্পন প্রকাশ করা, অন্যকে উপলব্ধি করতে দেওয়া। অর্থাৎ, মানুষের খুবই কাছাকাছি চলে যাওয়া।

শেষে, ২০৩৫ খৃষ্টাব্দের এক সকালে নবারুণের ঈপ্সিত অপারেশন সম্পূর্ণ হোল। দীর্ঘ চার ঘণ্টার অবসানে তার শরীরের গঠন হোল পূর্ণাবয়ব মানুষের মত। হাত পায়ের আঙ্গুল ঠিক মানুষের মত। চোখ, মুখ, নাক—এসব তো আগেই মানুষের মত ছিল। কিন্তু এবার সামঞ্জস্যময় হয়ে মাথায় চুল বসে যেন সত্যিই পুরোপুরি মানুষ হয়ে গেল সে।



রোবোট নবারুণ অপারেশনে মানুষ হচ্ছে

অপারেশন শেষ হবার পর আধঘণ্টা পার হোল। তার শরীরে কোনও স্পন্দন নেই। চোখ নিমীলিত। শরীর নিথর হয়ে বিছানায় প্রলম্বিত।
শঙ্কিত ডঃ সত্যশংকর নবারুণের মুখের দিকে তাকিয়ে। অনুপ্রভার চোখ

জলে ভরে এসেছে। শেষে নিজেকে সংযত করতে পারেন না অনুপ্রভা। বলে ওঠেন—তোমরাই শেষ করলে খোকাকে। ছেলেমানুষ বায়না ধরল, তোমরা সব জ্ঞানী-গুণী মানুষ, ছেলেমানুষের কথায় নাচলে। অপারেশন করলে। নবারুণ যে শেষ হয়ে গেল শংকর। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন অনুপ্রভা। রোবোসাার্জেন ডঃ কিচলু অপ্রতিভের মত কেবিন থেকে বেরিয়ে যান। ডঃ জেকব তাঁদের নিজেদের রুম টি, ভি, থেকে ওয়াচ করতে থাকেন নিথর নবারুণকে। শুধু রোবো-নিউরলজিস্ট ডঃ ব্রহ্ম একবার নবারুণের দিকে তাকান, আবার নবারুণ অঙ্কিত নার্ভসিস্টেমের ডায়াগ্রামের দিকে রাখেন। নিচু স্বরে প্রশ্ন করেন সত্যশংকর, ডঃ ব্রহ্ম, আপনি কি বুঝছেন? নবারুণের রোবোটিক সিস্টেম ফেইল করল?

—দেখুন ডঃ সত্যশংকর, নবারুণের ডায়াগ্রাম মতই সব কাজ হয়েছে। রোবো-নিউরলজিস্ট হিসেবে বলছি এই ডায়াগ্রামের কোথাও ত্রুটি নেই। তাছাড়া ওর সিলড পসিট্রনিক ব্রেনকে আমরা তো টাচ করিনি। তাহলে ফেইল করবে কেন নবারুণের রোবোটিক সিস্টেম।

কিন্তু সমস্ত দিন যায়। নবারুণের কোনও জ্ঞান আসে না। শক্তির বিন্দুমাত্র স্পন্দন দেখা দেয় না শরীরে।

রোরুদ্যমানা অনুপ্রভা ফিরে যান বাড়িতে আর রোবোটিক ইনসটিটিউটের মিটিংরুমে আবার জারুরী মিটিং বসে অ্যাপেক্স বডির।

ভার্গব বলেন—সত্যশংকর, এবার যা বলার তুমিই বলবে। এই অপারেশন আমরা কেউই চাইনি, একমাত্র তুমি আর তোমার নবারুণ ছাড়া। সো, ফর দিস ফেইলইউর উই আর নট টু বি ব্লেমড।

সত্যশংকর মাথা নিচু করে বসে থাকেন। বুকটা ব্যথায় ভারী হয়ে উঠেছে তাঁর। নবারুণ রোবোট হোতে পারে, কিন্তু তাঁদের জীবনে সে তো সত্যিই ছেলের মত ছিল। কি বলবেন অনুপ্রভাকে এখন? কি করে ফিরিয়ে দেবেন নবারুণকে? এ যে দ্বিতীয়বার পুত্রবিয়োগ ঘটল অনুপ্রভার।

ঢং, ঢং, ঢং! মিটিং রুমের দেওয়াল ঘড়িতে রাত নটা বাজল। আজ সকাল নটায় সুরু হয়েছিল অপারেশন। বার ঘণ্টা পার হয়ে গেল। রোবোট কি এতক্ষণ নিশ্চুপ থাকে? ধ্বংসই হয়ে গেল তবে নবারুণ! নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেন সত্যশংকর।

—লুক! লুক, সত্যশংকর! নবারুণ চোখ খুলেছে—মিটিং হলের টিভির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন ডাইরেক্টর ডঃ ভার্গব।

ভার্গব, জেকব, ব্রহ্ম, কিচলু, সত্যশংকর ছুটে এলেন সবাই নবারুণের কেবিনে। সত্যশংকর মুখ নিচু করে আনলেন নবারুণের মুখের কাছে।—খোকা, কেমন আছিস বাবা? বড় শংকিত স্বর সত্যশংকরের।

—আঃ, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট বাবা। বড় ব্যথা। আস্তে আস্তে হাত তোলে নবারুণ। সত্যশংকরের হাতে হাত রাখে।
চমকে ওঠেন সত্যশংকর। এ কার হাত! রোবোটের না মানুষের! যান্ত্রিক রোবোট মানুষের শরীরের মত উত্তাপ পেল কোথা থেকে! তবে কি নবারুণের ডায়াগ্রাম সত্যিই কাজ করছে!
সত্যশংকর আস্তে আস্তে হাত রাখেন হার্টের কাছে।
—মাই গড! আবার চমকান ডঃ সত্যশংকর। চেঁচিয়ে ওঠেন—ডঃ ভার্গব, হি ইজ ব্রিদিং লাইক এ ম্যান! হি ইজ নাও এ ম্যান!
নবারুণের জ্ঞান ফেরার কথা ইতিমধ্যেই পেঁছেছে অনুপ্রভার কাছে। ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকেন তিনি।
—খোকন, খোকন আমার! নবারুণের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।
অনুপ্রভার গায়ে মুখে হাত বোলায় নবারুণ। —মাগো, তুমি এমনি? তুমি এমনি দেখতে? এমনি মাখমের মত নরম তুমি?
চমকে উঠে বসেন অনুপ্রভা। দ্রুত হাতে চোখের জল মুছে ফেলেন। নবারুণের সর্বাঙ্গে হাত বুলান আর সচকিত হয়ে যান। বলেন, শংকর, এ যে সত্যিই মানুষ হয়ে গেছে! মানুষের মত তাপ-উত্তাপ, ভালবাসা, অনুভূতি নিয়ে এবার সত্যিই নবারুণ আমাদের সন্তান হয়ে গেল গো।
আনন্দ-অশ্রুর উন্মাদনায় রোবোট নবারুণ মানুষ নবারুণ জোয়ারদার হয়ে গেল। সত্যশংকর আর অনুপ্রভার হাত ধরে ফিরে এল বাড়িতে।

৬

সময় এগিয়ে চলে। সত্যশংকর এখন পঞ্চান্ন বছরের। অনুপ্রভার বয়স পঞ্চাশ। নবারুণ যখন প্রথম এল এঁদের জীবনে, সেদিন হিসেব করলে আজ নবারুণের বয়স ত্রিশ বছর।
নবারুণ বাড়িতে ফিরেই নিজেকে বারবার পরখ করেছে আয়নায়। তারপর বলেছে—বাবা, আমার জন্য একজোড়া প্যাণ্ট-সার্ট, জুতো তৈরি করে দেবে।
—সেকি? চমকান সত্যশংকর।
—এত বড় ছেলে, জামা-কাপড় না পরে থাকা কি উচিত? না, না, কোন কথা শুনব না। আজই অন্তত তোমারই একটা প্যাণ্ট-সার্ট দাও।
প্যাণ্ট-সার্ট পরার পর নবারুণকে সত্যিই রোবোট বলে চিনতে কষ্ট হয়। সত্যিই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে গেছে নবারুণ।
অনুপ্রভার এখন আর খুশী ধরে না। স্বয়ং-ভাবুক যখন ছিল নবারুণ তখনই সবদিকে কত সুবিধে হোত। এখন তো আবার অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

ফলে, অনুপ্রভার কোনও কারণে রাগ, অভিমান, দুঃখ হোলে ঠিক ধরতে পারে নবারুণ। মার দুঃখ-কষ্ট ভোলাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

কিন্তু তাই বলে নিজের স্টাডিরুমে বসে গবেষণার ব্যাপারে কিছুমাত্র ত্রুটি নেই নবারুণের। কত কি পড়ে, আঁকে-জোকে। যখন যা বই দরকার, এনে দেন সত্যশংকর। বড় সুখী পরিবার হয়ে উঠেছে সত্যশংকর-অনুপ্রভার।

এমনি সময়ে একদিন এসে উপস্থিত হল মণিময় জোয়ারদার, সত্যশংকর জোয়ারদারের ছোট ভাই-এর ছেলে।

সত্যশংকর আর মণিশংকর—এরা ছিল দুই ভাই। সত্যশংকর বিজ্ঞান জগতের মাঝে ডুবে থাকতেন। আর মণিশংকরের ছিল নানান ব্যবসা-বাণিজ্য। হঠাৎ বেশ কয়েক বছর আগে মণিশংকর মারা। মনিশংকরের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখার দায়িত্ব এসে পড়ল একমাত্র ছেলে মণিময়ের ওপর।

ছেলে হিসেবে মণিময় অত্যন্ত বাজে। মদ্যপ, জুয়াড়ী ও নানান বদগুণের আধার। তাই মণিশংকর মারা যাওয়ার পর ভাইপোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না সত্যশংকরের। মণিময়ের উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার একটি মাত্র কারণ অতি অল্প বয়সে মা মারা যাওয়ার পর অতিমাত্রায় অন্ধ পিতৃস্নেহ।

মণিময়কে দেখে তাই খুশী হন না সত্যশংকর। জিজ্ঞেস করেন—কিরে, বহু-দিন পর হঠাৎ যে এলি ?

—এই কেমন আছ তোমরা দেখতে এলাম। হ্যাঁ, শুনলাম এক রোবোট নিয়ে তোমরা খুব নাকি বাড়াবাড়ি সুরু করেছ? বাঁকা হাসি মণিময়ের ঠোঁটে।

—আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলালে খুশী হব মণি। ভাইপো যখন, তখন সবসময়েই এখানে আসতে পার। কিন্তু কোনও অশোভনতা সহ্য করব না। যাকে তুমি রোবোট বলছ সে আমাদের পুত্রতুল্য। ওর নাম নবারুণ জোয়ারদার।

—হাঃ, হা, হা! ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে মণিময়ের গলায়। রোবোটকে দেখছি সত্যিই ছেলে বানিয়ে ফেলেছ, জেঠু। এ্যা, যন্ত্র তোমার কি কাজ দেবে জেঠু ? ছেলের অবর্তমানে ভাইপোই ছেলে হতে পারে, একটা রোবোট নয়, এটা মনে রেখো। যাই জেঠির কাছে। সত্যশংকরকে কথার জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে মণিময় অনুপ্রভার ঘরে যায়।

অনুপ্রভা নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। মণিময়কে ঢুকতে দেখে চমকে যান। দীর্ঘ দশ বার বছর পর মণিময় এলো। ওর সম্বন্ধে অনেক দুর্নামই তাঁর কানে এসেছে। শংকিত হয়ে ওঠেন তিনি।

—জেঠিমা, কিছুদিন থাকতে এলাম তোমার কাছে। ব্যবসায়ে ভীষণ খাটা-খাটুনি। একটু বিশ্রাম নিতে এসেছি। তোমার কোন অসুবিধে হবে নাতো ?

—না, না, অসুবিধে কিসের! বহুদিন পরে এলি। আনন্দের কথা। থাক না কিছুদিন। মনের সন্দেহকে ঝেড়ে ফেলতে চান অনুপ্রভা।

—হ্যাঁগো জেঠি, তোমার সেই রোবোট ছেলে নবারুণ কৈ? জেঠুর কাছে ওর কথা শুনেছিলাম। বাঁকা হেসে জিজ্ঞেস করে মণিময়।

—খোকা এখন স্টাডিরুমে। পড়াশুনা করছে। যা না ওর ঘরে, আলাপ করে আয়। অনুপ্রভা সহজ গলায় বলেন।

—তোমায় যেতে হবে না মণি। খোকাকে বলে এসেছি। ও এখানেই আসছে। ওর ঘরে গেলে ও বিরক্ত হবে। ঘরে ওর জরুরী পড়াশুনার কাগজ ছড়িয়ে আছে কিনা। সত্যশংকর অনুপ্রভার পাশে এসে বসেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুপ্রভার ঘরে এল নবারুণ। ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াল মণিময়ের। এক্সট্রা হাই পাওয়ারড-অনুবীক্ষণ-যান্ত্রিক চোখে তাকাল মণিময়ের দিকে। নবারুণের এই দৃষ্টি এক্সরের মত। সমস্ত শরীর ভেদ করে চলে যায় যেন। তারপর ধীর গলায় বলে—কেন এসেছ? তোমার মতলব ভাল নয়।

—কি, এত বড় কথা! রোবোট হোয়ে আমাকে শাসাচ্ছিস আমার মতলব খারাপ বলে! রোবোট তুই, জেঠু-জেঠিমাকে জাদু করেছিস। দাঁড়া, তোর ঠাট্টামি বার করছি। রাগে ফুঁসতে থাকে মণিময়।

—অসভ্য! ইতর মানুষ! তুমি আজকেই চলে যাবে। অত্যন্ত স্থির গলা নবারুণের।

—জেঠু, জেঠি, একি ব্যাপার? একটা রোবোট তোমাদের ভাইপোকে শাসাচ্ছে, আর তোমরা চুপ করে আছ? সত্যশংকরকে পাশে পেতে চায় মণিময়।

—খোকা অযথা কাউকে খারাপ বলে না মণি। তুমি জান না, ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি আছে। আছে অনুভব করবার প্রচণ্ড ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা বলেই হয়ত সে কিছু উপলব্ধি করেছে। সত্যশংকর নবারুণের হয়েই কথা বলেন।

ওঃ, তাই নাকি! দৃঢ়ভাবে নিজের রাগকে সংযত করে মণিময়। মনে মনে বলে, এ অপমানের বদলা নিতেই হবে। তবে এই মুহূর্তে, এই পরিবেশে নয়। সহজ গলায় বলে—হঠাৎ রাগ হয়ে গেছিল, কিছু মনে কোর না নবারুণ। বাপরে, জামা-কাপড় পরে তোমাকে বোঝাই যাচ্ছে না রোবোট বলে। জেঠুরা না বলে দিলে তো আমি বুঝতেই পারতাম না। সত্যি, তোমাকে ভারী সুন্দর লাগছে। আপোষের গলা মণিময়ের।

স্বল্প হাসি ফোটে নবারুণের মুখে। বলে, থ্যাংক ইউ। চলি ড্যাড। কাজ আছে। শান্ত, সংযত পদে চলে যায় নবারুণ।

ঘরের উত্তপ্ত হাওয়া আবার সহজ হয়ে যায়। মণিময় বলে—জেঠু, রিয়েলি তুমি লাকি। রোবোট যে মানুষের মত হয় এই প্রথম দেখলাম। তোমার ছেলে না থাকার দুঃখ আর নেই, কি বল ?

—না তা নেই মণি। ও তো আমার চেয়েও পড়াশুনায় অনেক অ্যাডভান্সড। জানো, ওর নিজেরই কত টাকা আছে ব্যাংকে। করুক স্টাডি। ওকে তো বলেইছি, যদি লাগে, আমার টাকা-পয়সাও ওকে দিয়ে দেব ।

—সে কি জেঠু! রোবোটের পিছনে তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে দেবে! না, না, এটা ছেলেমানুষী। ভুলে যাচ্ছ কেন, লিগ্যালী, তোমার সম্পত্তির অধিকারী তো আমিই।

দ্রুত মণিময়ের দিকে তাকান সত্যশংকর। এক কুটিল অভিসন্ধির ছাপ দেখতে পান মণিময়ের চোখে। কথার জবাব দেন না। ঘর ছেড়ে চলে যান।

মণিময় খুব দ্রুত বন্ধুত্ব করে নেয় নবারুণের সংগে। নবারুণ মণিময়কে খুব পছন্দ না করলেও আজকাল কথাবার্তা বলে। সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনভিত্তিক। মণিময় কিন্তু নবারুণের কাজ-কর্ম করে দেয়। এমনকি লাইব্রেরি থেকে বইপত্রও এনে দেয়, একরকম প্রায় জোর করেই।

মাসখানেক কেটে গেছে। জোয়ারদার ফ্যামিলির সংগে যেমন নবারুণ একাত্ম হয়ে গেছে তেমনি মণিময়ও অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে ওদের তিনজনের কাছে।

সেদিন সন্ধেবেলা বন্ধুর বাড়িতে যাবেন অনুপ্রভা। সত্যশংকরকে বললেন—হ্যাঁগো, নিয়ে যাবে আমায় ?

সত্যশংকর বললেন—বড় ক্লান্ত লাগছে। খোকাকে নিয়ে যাও না কেন ?—নবারুণকে নিয়ে আজকাল বেড়াতে যেতে অনুপ্রভা জোয়ারদারের কিছুমাত্র অস্বস্তি হয় না। রাস্তায় বেরুলে লোকজন বুঝতেও পারে না নবারুণ মানুষ নয়, রোবোট।

—ঠিক আছে, তাই যাচ্ছি। দেখি, স্টাডি ছেড়ে ছেলে আবার যেতে রাজী হবে কিনা।

নবারুণ কিন্তু এক কথায় যেতে রাজী হোল। ভালোই হোলো মা। তোমার সংগে যাই। বেড়াতে গিয়ে কথা হবে।

অনুপ্রভা বেরিয়ে পড়েন নবারুণকে নিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে। তখন গোধূলি সন্ধ্যার ম্লান ছায়া আকাশে-বাতাসে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে।

বাড়িতে নিজের ঘরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছেন ডঃ সত্যশংকর। ঘরে ঢুকল মণিময়। —জেঠু!

—কে! চমকে ওঠেন সত্যশংকর। তুমি ? এ সময়ে ? কি চাই ?

—বসতে পারি ? বিনীত ভঙ্গি মণিময়ের।

—বোস, বোস। কি ব্যাপার ?
—জেঠু, আমার এক লাখ টাকার দরকার। এ টাকা না হোলে আমি খুব বিপদে পড়ব।
—এক লাখ টাকা! কি বলছ মণি ? হঠাৎ এত টাকা দেব কেন ?
—এ টাকা তো কিছুই না জেঠু। তুমি মাসে বিশ হাজার টাকা মাইনে পাও। খরচাপাতিই বা কি! ব্যাংকে যে ত্রিশ লাখ টাকা আছে সে সব তো মারা গেলে আমারই হবে। মনে করো তার থেকে অগ্রিম নিচ্ছি। কাটা কাটা কথা বলে মণিময়।
—মণি! ধমকে ওঠেন সত্যশংকর। সংযত হয়ে কথা বল। আমার কোন টাকাই তুমি পাবে না। আমার যা কিছু সব পাবে নবারুণ। ভুলে যেও না নবারুণই আমাদের সন্তান।
—তাই নাকি ? রোবোট-যন্ত্র আবার মানুষের সন্তান হয় নাকি ? বড় কথা শোনোলে জেঠু।
—মণিময়—
—চোখ রাঙিও না জেঠু। এই নাও উইল। সই কর এখানে। খারাপ কিছু লেখা নেই। শুধু লেখা আছে তোমার সব সম্পত্তি আমায় দান করে দিলে। নাও, লক্ষ্মীটি জেঠু, সই কর।
—না, সই করব না।
—সই করবে না ? দেখ তবে ? চকিতে পিস্তল বার করে সত্যশংকরের মাথায় লাগায় মণিময়।

অনুপ্রভার সংগে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় নবারুণ।
—কি রে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লি ? জিজ্ঞাসু চোখে তাকান অনুপ্রভা।
—মা, বাড়ি ফিরে চল। একটাও কথা নয়। দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ির দিকে চলতে থাকে নবারুণ।
ছেলের কান্ড দেখে অবাক হোয়ে যান অনুপ্রভা। মনে মনে বলেন—পাগলা ছেলেকে নিয়ে মহা মুস্কিল। কথার শেষে কিন্তু নিজেও ফিরে চললেন বাড়ির পথে, ছেলের পিছনে পিছনেই।

—তাহলে এই তোমার শেষ কথা জেঠু ? দলিলে সই করবে না ? তাহলে মরতে হচ্ছে তোমায় জেঠু। তুমি মারা গেলে আইন তো আর রোবোটকে সম্পত্তি দেবে না। সম্পত্তি হবে আমার। বাঁকা গলায় মণিময় শাসায় সত্যশংকরকে, শেষবারের মত।

—ভুলে যেও না মণি, আমাকে মেরেও তুমি নিস্তার পাবে না নবারুণের হাত থেকে। ও শুধু স্বয়ং-ভাবুক নয়, অনুভূতিশীল রোবোট। মনে রেখো, আমার ক্ষতি করলে তোমার নিজের ক্ষতিই তুমি করবে।
—চুপ, বুড়ো কোথাকার! ডাক ভগবানকে—পিস্তলের ট্রিগার টিপবার জন্য উদ্যত হয় মণিময়।
—আহ! সহসা এক অসহ্য যন্ত্রণাকাতর স্বর বার হয় মণিময়ের মুখ থেকে। পিস্তলটা ছিটকে মেঝেতে পড়ে যায়।
সত্যশংকর সামনে তাকান। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নবারুণ। উত্তেজিত স্পন্দন তার চোখে-মুখে; ক্রোধের অভিব্যক্তি তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। কি করলি রে মণিকে? ওরকম যন্ত্রণায় পড়ে গেল কেন রে?



রোবোট নবারুণ ছুঁড়ল বাতাসীগুলি

—তরঙ্গ-প্রবাহের গতিকে সামান্য ত্বরান্বিত করে ছুঁড়েছি মণির দিকে। এই যন্ত্র শুধু আমারই আছে বাবা। এই দেখ। পকেট থেকে ছোট সিরিঞ্জ বার করে দেখায় নবারুণ।

—এ কি যন্ত্র রে, খোকা ?

—সামান্য যন্ত্র, বাবা। এক দিকে হাওয়া ঢুকছে। ভিতরে যা যন্ত্র আছে সেটার সাহায্যে হাওয়ার চাপ হাজার গুণ বর্ধিত হয়ে, সামনের দিকে গুলির মত ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। যার গায়ে লাগবে, তার পক্ষে সেই বাতাসী গুলি কত ভয়ংকর দেখতেই তো পেলে।

ইতিমধ্যে অনুপ্রভাও এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরে। একি, মণিময় মেঝেতে পড়ে কেন ? কি হয়েছে ?

—মণি না পড়ে থাকলে আমি মরে থাকতাম মেঝেতে। মণি তো খুন করতে এসেছিল আমায়। খোকা না এসে বাঁচালে কি যে হোত। সুখী হাসি ডঃ সত্যশংকরের মুখে।

—খোকা, তাই তুই ছুটে বাড়ি ফিরে এলি ! অবাক চোখে অনুপ্রভা তাকান নবারুণের দিকে।

—তাই নাকি ! কি করে টের পেলি খোকা ? কোনও ব্যবস্থা রেখেছিলি নাকি ? সত্যশংকর বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ বাবা, রাডার যন্ত্রের মত একটা যন্ত্র আমার শরীর আর এই বাড়ির ঘরগুলোর সংগে যুক্ত রেখেছি। তার ফ্রিকোয়েন্সী এমন রেখেছি যে উচ্চকিত উত্তেজিত কণ্ঠস্বরই তাতে ধরা পড়ে। সাধারণ কথা যে পিচে হয়, সে ফ্রিকোয়েন্সী ওয়েভ আমি ধরবার চেষ্টা করিনি। তাতে সাধারণ কথাবার্তা আমার এই রাডারে ধরা পড়ছে না। কিন্তু বিপদ হলেই তো মানুষ উচ্চকিত হয়। তখনকার হার্ড ফ্রিকোয়েন্সী রাডারে ধরা পড়ে। তাই তোমার আর মণির বাক-বিতণ্ডা আমি রাডারে শুনতে পেয়েই ফিরে এসেছি।

—খোকন, তুই ওঁকে বাঁচিয়ে আমাকে বাঁচালি বাবা। স্নেহের আলিঙ্গনে নবারুণকে বুকে জড়িয়ে ধরেন অনুপ্রভা। আনন্দের অশ্রু নামে চোখ দিয়ে অনুপ্রভার।

সত্যশংকর অবাক হোয়ে তাকান নবারুণের দিকে। ও কি ! নবারুণের চোখে ও কি চিকমিক করছে ! তার চোখেও জলঝাপসা ছোঁয়া !

৭

মণিময়কে তাড়ানো হয়েছে বাড়ি থেকে। কিন্তু এক গভীর প্রশ্ন রেখে গেছে মণিময় ডঃ সত্যশংকরের মনে। আইন হিসেবে নবারুণ কি সত্যশংকরের উত্তরাধিকারী হতে পারে ? না, আইন তো সে সুযোগ দেয় নি। তবে ? তবে কি তার মৃত্যুর পর সবকিছু পাবে অপগণ্ড মণিময় ? তবে কি দান করে যাবেন নবারুণকে ? রোবোটকে দান করা যায় ? জৈবিক জীব কি যন্ত্রকে দান করতে পারে ? আইনে কি তা গ্রাহ্য, স্বীকৃত হবে ?

—বাবা ! চমক ভাঙ্গে সত্যশংকরের। নবারুণ আবার ডাকে। —বাবা !
—কিরে খোকা ?
—বাবা, এই দীর্ঘ পাঁচ বছর কি নিয়ে স্টাডি করছি তুমি জানতে চাওনি, আমিও বলিনি। কিন্তু আজ বলার সময় এসেছে। তুমি তো দেখলেই বাবা আমি তোমাদের সন্তান হলেও সমাজ ও আইনে স্বীকৃত সন্তান নই। তাই আমার সত্যিকার ভাই বা বোন যদি থাকত তবে তোমার অর্থের লোভে কেউ তোমাকে মারতেও আসত না আর আমার বন্ধু-সাথীও হোত।
অনুপ্রভা হেসে ফেলেন। বলেন, তুই কথা মনেও রাখতে পারিস খোকা। দেখ, নতুন ঝামেলা তৈরি করিস না।
—না বাবা, তুমি মত দাও, তাহলেই হবে। যে শারীরিক অক্ষমতার জন্য মা সন্তান দিতে অক্ষম, তাকে দূর করবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আমি করেছি বাবা। তুমি, মা, সম্মতি দাও বাবা।
—অনুপ্রভা ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান সত্যশংকর স্ত্রীর দিকে। অনুপ্রভা মাথা নিচু করেন।
ডঃ সত্যশংকর তাকান নবারুণের দিকে। প্রশ্ন করেন—কি করতে চাও খোকা ?
—বাবা, আপনি মার অপারেশনের ব্যবস্থা করুন। সার্জন যিনি অপারেশন করবেন তাকেই যা বুঝবার আমি বুঝাব। তবে একটা কথা বাবা, অপারেশনের টেবিলে আমিও থাকব। আমি ছাড়া সার্জেন অপারেশন করতে পারবেন না।
এক মাস প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকে নবারুণ। সার্জেনকে স্কেচ করে অপারেশন কি করে হবে বারবার বোঝালো। স্পেশাল মেটালিক পার্টস তৈরি করালো। অপারেশনের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ।
—মাগো, কিছু চিন্তা কোর না। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। অনুপ্রভাকে নিয়ে নবারুণ অপারেশন হলের দিকে এগিয়ে চলে। ডঃ সত্যশংকর অপারেশন হলের অ্যানাক্সি রুমে সার্জেনের সঙ্গে কথা বলছেন।
অনুপ্রভাকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হোল। চোখে ডেড-গ্লাস চশমা লাগানো হোল তাঁর। কানে সাউণ্ডলেস কর্ক ফিট করে দেওয়া হোল। তাঁর দৃষ্টি আর শব্দগ্রহণ ক্ষমতা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হল।
সার্জেনের সঙ্গে অপারেশন রুমে ঢুকল নবারুণ। নিজস্ব অপারেশন ইকুইপমেণ্টস্ বার করল। সুইচ অন করল। ইলেকট্রিক কারেণ্ট চালু করল। এইভাবে ক্লোরোফর্ম ছাড়াই উত্তেজনাসূচক গ্রন্থিগুলো ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল। নবারুণ বলল—সার্জেন, অ্যাবডোমেন ওপেন করুন।
—নবারুণ, অজ্ঞান না কোরে অপারেশন করব কি করে ?
—লাগবে না সার্জেন। অনুভূতিসূচক নার্ভগুলোকে তড়িৎশক্তির সাহায্যে অবশ

করে দিয়েছি। চোখে আর কানের নার্ভগুলোও সাময়িকভাবে অবশ করে দিয়েছি। অপারেশন করুন, মা কিচ্ছু কষ্ট পাবে না।

নবারুণের ডাইরেকশনে সার্জেন শেষ করলেন অনুপ্রভার অপারেশন। অপারেশন শেষ করে অপারেশন থিয়েটারের বাইরে এলেন সার্জেন আর নবারুণ।

উৎকণ্ঠায় ছিলেন ডঃ সত্যশংকর। জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছ অনু ? সার্জেন, অপারেশন কেমন হোল ?

—আশ্চর্য, ডক্টর। অপারেশন আমি করলেও অ্যাকচুয়েলি সবকিছুই আপনার নবারুণই করেছে। আমি ওর ইনস্ট্রাকশন মতো করেছি। এ জাতীয় অদ্ভুত অপারেশন আমি আগে কখনও করিনি। সুতরাং ফলাফল সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

নবারুণ এসে চেপে ধরল সত্যশংকরের দুটো হাত। —বাবা, অপারেশন সাক্সেসফুল। তিনদিনের মধ্যে মা ঠিক হয়ে যাবে। তখন চেক করিও মাকে। বাবা, এরপর তোমরা চাইলেই মা আমি ভাই-বোন পেতে পারবে। আর আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

তিনদিন পরেই ফিরে এলেন অনুপ্রভা। গাইনি-স্পেশালিস্ট দেখে বললেন—ডঃ সত্যশংকর, কনগ্র্যাচুলেশন। মিসেস জোয়ারদার মা হবার জন্য এখন সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠেছেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে ও জাতীয় অপারেশন এই প্রথম। এর সমস্ত গৌরব নবারুণেরই প্রাপ্য। আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবেন সার্জেন রোবো নবারুণকে।

নবারুণের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য ডঃ জোয়ারদার আর অনুপ্রভা এক বছর পর উপহার দিলেন এক সুন্দরী কন্যা।

নবারুণ উদ্বেল হয়ে উঠল আনন্দে। —মাগো, এই তো চেয়েছিলাম। আমার ছোট্ট বোন এল। কিচ্ছু ভেবো না, একে মানুষ করার সব দায়িত্ব আমার।

ডঃ সত্যশংকরের চোখে আনন্দের ঝলক। খোকা, তোর জেদেই সব কিছু হোল। কিন্তু আমরা যে বুড়োবুড়ি হয়ে গেলুম। একে সত্যি তুই মানুষ করে উঠতে পারবি তো ?

—কেন ভাবছ বাবা। তোমার বয়স ছাপ্পান্ন, মার একান্ন। অন্তত একশ বছরের আগে তোমরা তো আর মরছ না ? হাসতে হাসতে বলে নবারুণ।

—পাগল, একশ বছর কি করে বাঁচব ?

—ভেবো না বাবা, দীর্ঘায়ু করার যন্ত্র কি আমি করিনি ? করেছি বাবা। তোমার আর মার হার্ট সিস্টেম বছরখানেকের মধ্যে বদল করে দেব। দেখবে, আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচতে একটুও অসুবিধা হবে না।

অনুপ্রভা হেসে বলেন—পাগল-ছেলে। না হয় তোর কেরামতিতে একশ বছরই বাঁচলাম। কিন্তু বুড়ো-বুড়িদের সামলাবি কি করে ?
—তুমি ভাবছ একশ বছর বাঁচবে আর তোমাদের শরীরকে মজবুত রাখব না ? দেখো না কি করি। বোনটা হয়েছে। ওকে নিয়ে যদি কিছুদিন আনন্দই না করতে পারলে তাহলে কি পেলে জীবনে তোমরা, তোমরাই বল ?
—খোকা, মানিক আমার। সস্নেহে অনুপ্রভা নবারুণকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার স্নেহের হাত রাখেন নবারুণের কাঁধে। বলেন—খোকা, তুই আমাদের ছেলে হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুই আমার গুরু।
—বাবা, আমি তোমাদের শুধু ছেলেই, শুধু ছেলে হয়েই থাকতে চাই বাবা। আমার যা কিছু বিবর্তন, প্রগতি, সবই তো তোমাদের ঐকান্তিক ভালবাসায় হয়েছে। যন্ত্র আর মানুষের এই যে মিতালি ২০৪০ খৃষ্টাব্দে সম্ভব হোল, তার সব কিছু কৃতিত্ব তোমার আর মায়ের।
—নারে খোকা, সব কৃতিত্ব তোর। তুই-ই আমাদের গৌরব। অনুপ্রভা জড়িয়ে ধরেন স্নেহের উত্তাপে নবারুণকে বুকের মধ্যে। যন্ত্র আর মানুষ ভালবাসার উত্তাপে গলে একাকার হয়ে যায়।

রোবো-নবারুণের রিগ্যাল রাইট

রোবোট-মানুষ নবারুণ জোয়ারদার আজকাল বড় খুশী। ২০৫০ খৃষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে রোবো-নবারুণ অনুভব করছে, উপলব্ধি করতে পারছে, সে সত্যিই একাত্ম হয়ে গেছে ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার পরিবারের সংগে। অনুপ্রভা জোয়ারদারের মমতায় যন্ত্রমানুষ নবারুণ তার অনুভূতিশীল অ্যানড্রয়েড বডিতে আনন্দ-তরঙ্গকে ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত হতে দেখে। এরই সংগে, ছোট্ট বোন রোবোনা, তার খেলার সাথী হয়ে তাকে মানুষী ভালবাসায় জড়িয়ে ফেলেছে। বলতে গেলে কি, মেয়ে রোবোনার জন্য অনুপ্রভা, বা, ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার কারুরই বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। দুজনেই জানেন, রোবো-নবারুণের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই, তারই চিন্তাধারাপ্রসূত তথ্যাবলীর সাহায্যে অপারেশন করেই, মেয়ে রোবোনাকে জন্ম দিয়েছেন অনুপ্রভা। মেয়ের তাই নাম দিয়েছেন অনুপ্রভা, রোবোনা, রোবোর বুদ্ধি থাকে আনা, রোবোনা। রোবোনাকে দেখাশুনা, লেখাপড়া করানো, সবকিছুই বলতে গেলে করে রোবোট নবারুণ।
একদিন অনুপ্রভা হেসে অনুযোগ করলেন—কিরে নবারুণ বোনকে পেয়ে যে আমাদের ভুলেই গেলি। দিনরাত ওকে নিয়ে থাকছিস, একবারও তো আমাদের কাছে আসিস্ না আজকাল ?
—না মা, তোমাদের, কখনও ভুলি ? তোমার পাছে কষ্ট হয় তাই বোনকে সামলাই। দেখো না, রোবোনাকে কত কিছু শিখিয়ে বিরাট বিজ্ঞানী করে তুলব। রোবোসাইকলজিস্ট ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের মেয়ে রোবোনা জোয়ারদার রোবোট বিষয়ে অদ্বিতীয় সাইকলজিস্ট হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করবে।
—পাগল কোথাকার! সস্নেহে অ্যানড্রয়েড বডিতে হাত বুলিয়ে দেন অনুপ্রভা। স্নেহের প্রলেপে অ্যানড্রয়েড বডির বহির্গাত্রে তাপতরঙ্গ বর্ধিত হয়ে রাঙ্গা হয়ে ওঠে নবারুণ।
ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার আজ নব্বই বছরের বৃদ্ধ, অনুপ্রভা ৮৫ বছরের বৃদ্ধা। কিন্তু রোবোট নবারুণ তার স্পেশাল অপারেশনে দুজনেরই হার্ট রিপ্লেশ করেছে মেটালিক ভাল্বযুক্ত অর্গেনোহার্ট বসিয়ে। ফলে বয়স হলেও, দুজনেই আজও কর্মক্ষম। তবে এই হার্ট কাজ করবে ঠিক আরও দশ বছর, অর্থাৎ ডঃ জোয়ারদার, বাঁচবেন ঠিক একশ বছর, আর অনুপ্রভা জোয়ারদার ৯৫ বছর।

মেয়ে রোবোনা বড় হচ্ছে। দশ বছরের রোবোনা রোবোট দাদা নবারুণের বিরাট ভক্ত। রোবো-নবারুণের কাছ থেকে সহজতম পন্থায় অংক, পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ এই বয়সেই পেয়ে গেছে রোবোনা।

সব কিছু সঠিকভাবে চললেও একটা চিন্তা প্রতিনিয়তই মাথায় ঘোরাফেরা করে ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের। রোবোট নবারুণ হয়ত আরও দশবছর, মানে যতদিন তারা বাঁচবেন, ঝামেলায় পড়বে না। কিন্তু ২০৬০ খৃীস্টাব্দে যখন তাঁরা মারা যাবেন, রোবোট নবারুণকে তখন কে বিপদ থেকে বাঁচাবে? বেচারা নবারুণ, মানুষ হতে চাইছে, মানুষের মত সবকিছু করতে চাইছে, কিন্তু পুরোপুরি তাতো সম্ভব নয়।

রোবোট নিয়ম মাথায় ঘোরাফেরা করে ডঃ জোয়ারদারের। প্রথম ধারা বলছে, কোনও রোবোট, মানুষের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, বা, নিশ্চুপ হয়ে থেকে মানুষের ক্ষতির কারণ হবে না। দ্বিতীয় ধারা বলছে, রোবোট, মানুষের হুকুম মানতে বাধ্য। তবে সেই হুকুম যদি প্রথম ধারার কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে রোবোট সেটা মানতে বাধ্য নয়। আর সবশেষে, তিন নম্বর ধারা বলছে রোবোট ততক্ষণই নিজেকে বাঁচাবার সব ব্যবস্থা নিতে পারে, যতক্ষণ না সেই কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর ধারার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিপদের সূচনা না করে।

ডঃ জোয়ারদার রোবোট নবারুণকে মুক্তি দিয়েছেন দ্বিতীয় ধারার কঠিন বাঁধন থেকে। তাই রোবোট নবারুণ মানুষের কথামত চলতে বাধ্য নয় আজ। কিন্তু এক ও তিন নম্বর ধারা থেকে তো মুক্ত নয় নবারুণ। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে, মানুষদের হাতে পরে রোবোট নবারুণকে বেকায়দায় না পড়তে হয়। কে সামলাবে রোবোট নবারুণকে তখন? সমস্ত জ্ঞান দিয়ে থাকে মানুষ করেছেন, সে আজ তার সন্তানতুল্য। হোক না সে কৃত্রিমানব, তবু তার জন্য চিন্তা হয় বৈকি ডঃ জোয়ারদার আর তার স্ত্রী অনুপ্রভার।

সময় এগিয়ে চলে। দশ বছর পার হয়ে যায় যেন চোখের পলকে। একশ বছরে পড়েন ডঃ জোয়ারদার আর পচানব্বই-এ পড়েছেন অনুপ্রভা। দুজনেই জানেন মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে এবার। দুশ্চিন্তা দুজনের মাথায়—কি হবে এখন রোবোট সন্তান নবারুণের, মেয়ে রোবোনার, রোবোনা এখন কুড়ি বছরের পূর্ণ যুবতী। চিন্তার মেঘ মুখে নিয়ে, বারান্দায়, ইজিচেয়ারে বসে আছেন ডঃ জোয়ারদার। পাশেই বসে অনুপ্রভা।

—কি ভাবছ তোমরা এত বল তো? পাশে এসে দাঁড়ায় রোবোনা। রোবোনার পিছনেই রোবোট নবারুণ।

—তোদের কথাই। চিন্তিত গলা জোয়ারদারের।

—কেন? বুড়ো হচ্ছ বলে ভাবছ? হেসে বলে রোবোনা।

—বাঃ, ভাবব না। জানিস না, একশয় পা দিয়েছি। যাবার সময় হোল। তবু বিয়ে থা দিয়ে তোকে সংসারী করে গেলাম না। তা ছাড়া, আমাদের পরে, তোরও বিয়ে হয়ে গেলে নবারুণকে কে দেখবে? নবারুণ যে বিজ্ঞানী মহলে বহুলোকের চক্ষুশূল। তাই নবারুণ বিপদে পড়বেই তখন ভয় সেখানেই।

—না বাবা, ভয় নেই। তোমাদের নবারুণকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না। আর বোন রোবোনার জন্য ভাবছ কেন? আমিই তো রইলাম। রোবো নবারুণ আশ্বস্ত করতে চায় চিন্তিত ডঃ জোয়ারদারকে।

—নারে, ভাবনা আসেই। রোবোনার যদি বিয়ে হয়ে যেত, তবে রোবোনা আর তার বর না হয় তোকে দেখতে পারত। অনুপ্রভা মমতা জড়িত গলায় বলেন।

—তাছাড়া, অন্য সমস্যাও রয়েছে। সেটাও ভাববার কথা। ডঃ জোয়ারদারের গলায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

—অন্য সমস্যা! এবার অনুপ্রভাই অবাক হোন।

—মনে নেই, বখাটে ভাইপো মনিময় কি বলেছিল এখানে এসে? 'রোবোট যন্ত্র কি আর মানুষের সন্তান হয়?' তাই আমাদের পর, আমরা চাইলেও আইন বোধ হয় আমাদের সম্পত্তি নবারুণকে ভোগ করতে দেবে না? রোবোটদের জন্য এমনতর কোনও ব্যবস্থা আইনে তো নেই। বড় চিন্তিত ডঃ জোয়ারদার।

—নাইবা থাকল, নবারুণের তো টাকার অভাব নাই। ওর টাকাতেই না হয় ও নিজেকে চালাবে। ডঃ সত্যশংকরকে বোঝাতে চান অনুপ্রভা।

—আহ! বুঝছ না কেন অনু। আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী যদি রোবোট-নবারুণকে নাই করতে পারি, তবে শুধু টাকা কেন, এই বাড়িঘর সব কিছু থেকেই ও বঞ্চিত হবে। এমনকি, আমার নিজস্ব এই ল্যাবোরেটরি এমন কি ওকেও যে ল্যাবোরেটরি গড়ে দিয়েছি এই বাড়িতে, সব থেকেই ওকে উচ্ছেদ করতে পারবে মণিময়, বা অন্য কোনোও আত্মীয়েরা।

—তাইতো! বড্ড বিপদ দেখছি। প্রথম এই যেন বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারলেন অনুপ্রভা।

—অনু, টাকাটা নাই পাক নবারুণ, তার জন্য একটুও চিন্তা নেই। ও নিজেই যথেষ্ট রোজগার করতে পারবে। কিন্তু ওর রিসার্চের ল্যাবোরেটরির সবকিছু থেকে ওকে কেউ যদি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তবে রোবোট বিজ্ঞানের নতুনতর জগৎ, যা শুধু রোবো-নবারুণেরই আবিষ্কার, সবই শেষ হয়ে যাবে। সে যে সমস্ত মানব জাতির ভয়ঙ্কর দুঃখের দিন হবে অনুপ্রভা।

—জানি বাবা এমন যে কিছু হতে পারে না, তা নয়।

নবারুণের গলা শুনে চমকে ফিরে তাকান ডঃ সত্যশংকর। কখন যে শব্দহীন-অ্যানড্রয়েড-পদক্ষেপে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে নবারুণ, খেয়াল করে নি সত্যশংকর বা অনুপ্রভা।

—ভেবো না তোমরা, নিজ অধিকার অর্জন করার জন্য আমাদের চেষ্টা তো করতেই হবে। প্রকৃতি, পরিবেশ, সবার সঙ্গে লড়াই না করেই কি মানুষ আজ সমগ্র পৃথিবীর অধিকার পেয়েছে? নবারুণের নরম ধাতব গলায় দৃঢ়তার ছাপ।

—কিন্তু নবারুণ, তুমি তো রোবোটিক এক ও তিন নম্বর ধারা থেকে মুক্ত নও। তাই আজ তোমার শত্রু মানুষই। দেখনি তুমি, তোমাকে কখনও রাস্তায় একলা বেরুতে দিই না, কেননা, খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়লে, তারা তোমাকে বিপদেই ফেলতে পারে।

—জানি বাবা। ধীর ধাতব কন্ঠ নবারুণের।

—শুধু কি তাই, রোবোটিক-সায়েন্টিস্টস্ মহলে সবাই তোমাকে-আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, জান না? সবাই আমাকে বলে, পাগল। কোনও রোবোটকে প্রকৃত বাইওনিক মানুষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ শুধু আমার উন্মাদ আশা আর তোমার জটিল যান্ত্রিক যন্ত্রপাতির উল্টোপাল্টা বিদ্ঘুটে কাজকারবার, এ ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞান জগতে এর দাম নাকি কানাকড়িও নয়। সত্যশংকর বড় বিমর্ষ হয়ে ওঠেন।

—জানি বাবা, এসব তো বিজ্ঞান জগতেই হয়। বিখ্যাত আবিষ্কারক গ্যালিলিওকে পাগল বলে, বন্দী করে, শেষে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে না নাকি সেযুগের মানুষেরা? তবু কি মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যে হয়ে গেছে? বিজ্ঞানের সত্যতা ইতিহাসের মাপকাঠিতেই বিচার হয় বাবা। দেখবেন, সময় একদিন বলে দেবে, ডঃ সত্যশংকরও পাগল নয়, আর তার সন্তান এই রোবোট যা করছে তা ইর‍্যাটিক কার্যকলাপ নয়।

—নবারুণ, এযে অনেকটা সেন্টিমেন্টাল মানুষের কথা হয়ে গেল। রোবোট-মানুষ তো ফ্যাক্টস, ফিগারস, এসব দিয়ে যুক্তিতাত্ত্বিক কথা বলে। তাহলে সেন্টিমেন্টাল হোচ্ছ কেন তুমি?

—না বাবা, আমি যুক্তিনির্ভর কথাই বলছি। আমি নবারুণ হলেও যে রোবোট সেটা জানি। সে জন্যই আমাদের রোবোটিক তৃতীয় ধারাকে আমি সযত্নে মেমারি-সেলে রেখে দিয়েছি। তুমিই বল বাবা, তিন নম্বর রোবধারা কি বলেনি, মানুষের ক্ষতি না করে আমরা নিজেদের রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্হা করতে পারি?

—তা পার নবারুণ। নির্দ্বিধায় বলেন ডঃ সত্যশংকর।

—তাই যদি হয়, আমাকে, আমাদের রোবোট সমাজকে বাঁচাবার জন্য কিছু ব্যবস্থা যদি করি তবে কি তা অন্যায় হবে? প্রশ্ন তুলে ধরে নবারুণ।

—তার মানে ! চমকান ডাঃ সত্যশংকর জোয়ারদার। কি ব্যবস্থা করবে নবারুণ ?

—সেল্ফ-ডিফেন্স। মানুষকে আঘাত করব না, তবে মানুষের অন্যায় আক্রমণ অত্যাচারকে রোখবার ব্যবস্থা তো করতেই। হবে আর এখন তাই নিয়েই চলেছে আমার কাজ কারবার।

—যাক্ কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম নবারুণ। তোমার রোবোটিক-ব্রেনে এই চিন্তার উদ্ভাবন যে হয়েছে তাতেই আমি খুশী। আমি জানি, এরপর নবারুণ নিজেকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবে। আর নবারুণের মধ্য দিয়েই আমি আর অনুপ্রভা বেঁচে থাকব মৃত্যুর পরেও।

—বাঃ বেশ। নবারুণদাকে নিয়ে সেই তখন থেকে গল্প করে চলেছে। একবারও আমার কথা ভাববার সময় হয় নিন নাঃ ? রোবোট মুখ ভার করে এসে দাঁড়ায়।

—তোকে আর নবারুণকে নিয়েই তো চিন্তা আমাদের। সস্নেহে বলেন অনুপ্রভা।

—নাঃ, তোর জন্য আমার একটুও চিন্তা নেই রোবোট। তোকে সবসময়ে রক্ষা করবে নবারুণ। কিন্তু নবারুণকে রক্ষা করবে কে ? আমাদের মারা যাবার পর, বিপদে কে সামলাবে তোকে। সেই চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে রোবোনা। ডঃ সত্যশংকর বলে ওঠেন।

—কেন আমি, আমি আমার জীবন দিয়ে রক্ষা করব নবারুণদাকে। কিছু ভেব না বাবা। দৃঢ় দৃপ্তস্বর রোবোনার।

—পারবি তো ? সমস্ত বিপদ থেকে ওকে সামলাতে পারবি তো মা ? আবেগে ঝরে পড়েন সত্যশংকর।

—পারব, পারতেই হবে বাবা। নবারুণদা কি শুধু তোমাদেরই সন্তান, আমারও কি দাদা নয় ?

—আহ্ মা ! বড় শান্তি দিলি। এবার মরতেও আমি আর ভয় পাই না। সুখী আনন্দে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে ডঃ সত্যশংকরের চোখে। অনুপ্রভার চোখও জলে চিকমিক করে ওঠে।

নবারুণ তার অ্যানড্রয়েডের আর্টিফিসিয়ান হাত দুটো দিয়ে রোবোনার হাতটা জড়িয়ে বলে,—কি বল রোবোনা, আমরা দুজনেই দুজনকে দেখব। অর্গ্যানিক লেডি রোবোনা, আর অ্যানড্রয়েডিক রোবোট নবারুণ, পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ আর যন্ত্রের অক্ষয় মিতালি রেখে যাবে।

—হ্যাঁ দাদা, তাই হবে। আমরা নতুন যুগের সূচনা করব।

২

নবারুণের সেট করা স্পেশাল-টাইম স্পেশমেকার ঠিক একশ বছরই বাঁচিয়ে

রাখল ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারকে। আর প'চানব্বই বছর বাঁচলেন অনুপ্রভা জোয়ারদার। তারপর সুপ্রো স্পেসমেকারের লাইফ শেষ হলো। একই দিনে, একই সাথে, সত্যশংকর আর অনুপ্রভা মারা গেলেন। যথাসময় শেষকৃত্য শেষ হোল।
ডঃ সত্যশংকরের কটেজ "রোবো-হাউস" এখন নিথর বেদনায় ম্রিয়মান। রোবোনা মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করে। রোবোনাকে বোঝায় সান্তনা দেয় নবারুণ। ক্রমে ক্রমে দুঃখ সহনীয় হয়ে আসে। রোবোনা, নবারুণ লেগে যায় আবার নিজেদের কাজে।
সেদিন পোর্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে গেছে রোবোনা। বাড়িতে কাজ করতে করতে নবারুণ শুনতে পেল কলিং বেলের শব্দ, ট্রিং, ট্রিং, ট্রিং। টেলিভেশেনিক ক্যামেরা চোখে, ল্যাবোরেটারি থেকেই পিপ্-হোল দিয়ে নবারুণ দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে ডঃ সত্যশংকরের সেই বখাটে ভাইপো মণিময়। মুহূর্তে ব্রেনসেণ্টার সজাগ করে দিল নবারুণকে, সজাগ থাক, সাবধান হও। নবারুণ রিমোট কণ্ট্রোলে দরজা খুলে দিল।
মণিময় ভিতরে এসে হৈ-চৈ করে চে'চিয়ে উঠল—আরে কোথায় রে তোরা? রোবোনা! কোথায় তুই?
রোবোনা এইই প্রথম দেখল মণিময়কে। বাবা-মায়ের কাছে মণিময়ের নাম শুনলেও এরকম বখাটে ছেলের সংগে কোনও রকম সম্পর্কও ও'রা রাখতে চাননি। তাই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল অদেখা মণিময়ের দিকে রোবোনা।
—কিরে চিনতে পারছিস না? আমি তোর জেঠতুতো দাদা, মণিময়। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোদের সেই রোবোটটা আছে, না, এতদিনে শেষ হয়ে গেছে?
রোবোনা কি বলবে ভাবছে। ঠিক এমনি সময়ে শব্দোত্তর-শব্দ ড্রইংরুমের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে লাল আলোকে জ্বালিয়ে দিল। সচকিত হয়ে উঠল রোবোনা। বুঝল, রিসার্চ-ল্যাব থেকে নবারুণ ২০,০০০ সাইকেলের বেশি এই শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে লাল সংকেত আলো জ্বালিয়ে, তাকে সাবধান করেছে। শব্দোত্তর বলেই এই শব্দ তরঙ্গ মানুষের কানে ধরা পড়ে নি, তাই ধরতেও পারে নি মণিময়।
—এ কি! হঠাৎ লাল আলো জ্বলল কেন? কে জ্বালাল! অবাক হয়ে যায় মনিময়।
—কি জানি, কে জ্বালাল। বাবা কোথায় কি ব্যবস্থা রেখে গেছেন বলা মুস্কিল। তবে নানা রকম বিশেষ সাবধানিক ব্যবস্থা তো আছেই। সবই অটোমেটিক ব্যবস্থা। সেজন্যই বিশেষ কারণেই হয়ত লাল আলো জ্বলেছে। ঠাণ্ডা গলায় বলে রোবোনা।
—যাক, যে কারণে এসেছি, সময় নষ্ট না করে সেটাই বলি এবার। কাকার

ছেলে নেই, সেই হিসাবে আমিই কাকুর ছেলের মত। সেজন্য, কাকুর প্রপার্টিতে তোর সংগে আমার অর্ধেক শেয়ার আছে, বুঝলি। এসেছি সেই শেয়ারই বুঝে নিতে। বাঁকা গলায় বলে মনিময়।

—নাঃ, কোন শেয়ারই আমার নেই, আর তোমারতো নেয়ই। বাবা সবকিছুই দিয়ে গেছেন আমাদের এই "রোবো-রিসার্চ-সেন্টারে"। আর তার সবকিছু দেখাশুনার ভার নবারুণদার হাতে।

—নবারুণ দা! অবাক স্বর মণিময়ের।

—কেন, নবারুণদাকেতো দেখেছ তুমি। আমার দাদা। বাবার সৃষ্ট সেই রোবোট, যা ধীরে ধীরে আজ মানুষের মত হয়ে গেছে। বলে রোবোনা।

—ওঃ, সেই রোবোট! আই সি! দেখ রোবোনা, আজ আর আমার অল্প বয়স নেই যে রোবোটের ধমকে ফিরে যাব। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, জ্ঞান-গম্যি কম হয় নি। রোবোট যে একরাশি যন্ত্রের জটপাকানো কেরামতি তা জানি। ঐসব রোবোট-ফোবোটকে ঠাণ্ডা করার রাস্তা আমরা জানাস। ভাবিন না যে রোবোট সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান-গম্যি নেই। সোজা কথায় বল, কাকুর সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দিবি কি না?

—না, দেবে না। তুমি আর রোবোনাকে বিরক্ত কোরো না। চলে যাও। কঠোর যান্ত্রিক গলার স্বরে ফিরে তাকায় মণিময়। দেখে তার পিছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে রোবোট নবারুণ।

—আহা! আবার ঝামেলা করতে এল রোবোটটা। বিরক্তি ঝরে পড়ে মণিময়ের গলায়।

—ঝামেলা নয়, সাবধান করতে এসেছি তোমায় মণিময়। রোবোনাকে কেউ বিরক্ত করে এ আমি চাই না। ধমকে ওঠে রোবোট নবারুণ।

—কি! তুমি রোবোট হয়েও আমার মত মানুষের ওপর হুকুম চালাচ্ছ? তোমাকে এ ক্ষমতা কে দিল? রেগে ওঠে মণিময়।

—আমি স্বাধীন রোবোট। আমার ইচ্ছাতেই আমি কাজ করতে পারি। এ অধিকার দিয়ে গেছেন আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার পালক পিতা ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার।

—তাই বুঝি! ঠিক আছে, আমার অধিকার কি করে আদায় করতে হয় আমি দেখিয়ে দেব। রোবোনা, ভুলিস না, রোবোট-যন্ত্র দিয়ে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা বৃথা। আমার নাম মণিময় জোয়ারদার, কথাটা মনে রাখিস্। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে যায় মণিময়।

—হিঃ, হিঃ, হিঃ। হেসে ফেলে রোবোট নবারুণ। বলে, দেখলি তো রোবোনা, ভীতুটা কেমন দুড়দাড় করে পালিয়ে গেল।

—না নবারুণদা, সত্যিই চিন্তা হচ্ছে এবার। বাবা বহুবার এই মণিময়দার

কথাই বলেছে আমায়। মণিময়দা নানান্ বিপদ সৃষ্টি করতে পারে শুধু অর্থের লোভেই, বাবাই বলে গেছে কথাটা। ভয় পেয়ে আজ পালিয়ে গেলেও কখন কিভাবে আঘাত করবে কে জানে?

—ভয় নেইরে রোবোনা। তোকে সব সময়েই পাহারা দেব আমি। মনে নেই বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, সবসময়ে সব বিপদ থেকে তোকে রক্ষা করব।

—নাঃ নবারুণদা, ভয় আমার জন্য নয়, ভয় যে তোমার জন্যই। তুমি নিয়মের বাঁধনে যে এখনও বাঁধা। স্বাধীনতা পেলেও সার্বিম স্বাধীনতা কোথায় তোমার? ভয় তো সেখানেই। তোমাকেই যদি আঘাত করে? ভীতস্বর রোবোনার।

—ধ্যুৎ পাগলী। চল, খেয়ে দেয়ে কলেজে যাবি। আমিও তোর সংগে তোর কলেজে যাব। একলা তোকে যেতে দেব না। মণিময়কে বিশ্বাস নেই।

—সেই ভাল। তাহলে তোমাকেও একলা থাকতে হবে না নবারুণদা। একলা থাকা মানেই তো তোমারও বিপদ।

—ভীতু কোথাকার। হিফ্ হিফ্ হিফ্। হেসে ওঠে যন্ত্র মানুষ নবারুণ।

৩

নবারুণ রোবোনাকে কলেজে পৌঁছিয়ে চলে যায় কলেজ লাইব্রেরিতে। তারপর সময়মত আবার পৌঁছে যায় কলেজ গেটে। ব্যবস্থাটা মোটামুটি ভালইর চলছিল।

সেদিন কলেজে রোবোনাকে পৌঁছিয়ে রোবোট নবারুণ ভাবল, একবার রোবো-ইনস্টিটিউটে ঘুরে আসা দরকার, জরুরী কতকগুলো খবরের জন্য।

নবারুণকে প্রথমে দেখলে রোবোট বলে আজকাল চেনাই যায় না। মুখ-হাত-পা প্রায় মানুষেরই মত। চলা-বলা সেও মানুষেরই কাছাকাছি। লম্বায়-চওড়ায়ও, ঠিক সাধারণ জৈবিক প্রাণীর মতই।

নবারুণের পরনে প্যান্ট সার্ট। পায়ে সফট্‌ফোমে ঢাকা স্টেইনলেস্ সু। রাস্তা দিয়ে নবারুণ চলেছে। দুপুর বেলা, রাস্তা অনেকটা নির্জন। হঠাৎ ভোজবাজির মত সামনে উপস্থিত হোল মণিময়।

—এই যে! রোবোট হয়ে, মানুষের মত সেজে সবকিছু দখল করতে চাইছিস্? দেখাচ্ছি মজা! মণিময়ের চোখে ক্রুর হিংস্রতা।

রোবোটের তৃতীয় ধারায় সজাগ হয়ে ওঠে নবারুণ। এই ধারায় রোবোট নিজ অস্তিত্বকে রক্ষার জন্য সব কিছু করতে পারে। তবে মানুষের ক্ষতি না করেই তা করতে হবে, এটাও এই ধারার নির্দেশ। রোবোট নবারুণ, তার কব্জির কাছে লুকানো স্প্রিং-এর বলে চাপ দিল। এই বল নির্ধারকটি অনেকটা হীরের ব্রেসলেটের মত দেখতে বলে মণিময় সেদিকে খেয়ালই দেন নি। কিন্তু আসলে

এরই মধ্যে আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোক উৎস ও আলোক সংবেদনশীল কোষ। রবার ও ধাতুর স্তর একের পর এক সংযোগে গঠিত স্থিতিস্থাপক সরু টিউবের মধ্যে দিয়ে হাতের কবজির সংগে সংযোগ। এই টিউবের মধ্যে দিয়ে আলো পৌঁছাল সংবেদনশীল কোষে। রোবোর কম্পিউটার ব্রেন জানিয়ে দিল, নবারুণ আক্রমণ থেকে সজাগ হও।

নবারুণ সংগে সংগে শরীরের চারপাশে ইলেকট্রিক ওয়েভ সার্কিট চালু করে দিল, যাতে মণিময় তাকে আঘাত করতে না পারে। এই অবস্থায় মণিময় যদি নবারুণকে ছোঁয় তবে তারমৃত্যু নির্ঘাত। বৈদ্যুতিক লাল আভায় নবারুণকে মনে হোতে লাগল এক দেদীপ্যমান পুরুষ।

মাই গড ! চমকে উঠল মণিময়। ওঃ, এভাবে তোকে শায়েস্তা করা মুস্কিল। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। ভাবছিস তোকে ঠাণ্ডা করার রাস্তা আমি জানি না। রোবোট নিয়ে পড়াশুনা আমিও করেছি। তোর সব খবর আমি এতদিন ঠিকই রেখে এসেছি। দুনম্বর রোবোটিক ধারা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হলে কি হবে, এক নম্বর ধারামতে আমি কেন কোন মানুষকেই তুই আঘাত করতে পারবি না। বরং আমাদের প্রয়োজনে, আমাদের আদেশ শুনতে বাধ্য। শোন তবে, যা বলছি আদেশ পালন কর।

—নাঃ, আমি মুক্ত রোবোট। মানুষের আদেশ শুনতে বাধ্য নই আমি। কর্কশ স্বরে বলে ওঠে নবারুণ।

—কিন্তু এক নম্বর ধারাকি একথা বলেনি, মানুষের ক্ষতিকারক কোন কাজ তুই করতে পারবি না। সেক্ষেত্রে দুনম্বর ধারা মতে মুক্ত হয়েও তোর মুক্তি নেই। তুই যে অবস্থায় আছিস, সেই অবস্থায় তুই হয়ত আমাকে আঘাতই করবি। তাই আমার বিপদ বুঝে তোকে আদেশ দিচ্ছি, মানুষ সেজে না থেকে মানুষের মত সাজা জামাকাপড় ফেলে দে। তুই যে রোবোট জানুক সবাই। তারপর রাস্তার ধারে চুপটি করে বসে থাক। যাতে কারুর ক্ষতি করতে না পারিস। জানি, তোকে আঘাত করা মুস্কিল কিন্তু এখন এভাবে বসে থাকলে তুইও আমাকে আঘাত করতে পারবি না। বাঁকা স্বর মণিময়ের।

রোবোট নবারুণ এক নম্বর ধারা মানতে বাধ্য। তাই মণিময়ের হুকুম মেনে, জামাকাপড় ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। নাঙ্গা অ্যানড্রয়েডিক শরীর নিয়ে রোবোট নবারুণ রাস্তার ধারে, লাইটপোস্টের নিচে চুপটি করে বসে পড়ল।

—চলি রে রোবোট নবারুণ। এখন কাকুর বাড়ি গেলে তুই আর বাধা দিতে পারবি না। রোবোনাও কলেজে। দেখি ওখান থেকে কিছু মালকড়ি হাতানো যায় কি না। মুচকি হেসে চলতে থাকে মণিময়।

—বৃথা চেষ্টা কোরো না মণিময়। আমি আর রোবোনা ছাড়া বাড়িতে ঢোকার উপায় কেউই জানে না। ভেবো না, ধাক্কালেই দরজা খুলবে। ঐ

দরজায় চাবি নেই। লেসার বীমের কারসাজিতে দরজা বন্ধ খোলা হয়। আর তাকে অপারেট করার বুদ্ধি আর যার থাক, তোমার নেই।
—তবে রে! ধাঁ করে পাথর ছুঁড়ে মারে নবারুণের দিকে মণিময়।
—ক্লিক! একরাশ আগুনের ঝলক ছুঁড়ে দেয় মণিময়ের দিকে নবারুণ। মণিময় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে রোবোনা অবাক হয়ে যায়। রোবোট দাদা নবারুণের দেখা নেই। কি ব্যাপার! হঠাৎ কোথায় যেতে পারে সে? সাধারণত যতক্ষণ তার ক্লাস শেষ না হয়, রোবোট নবারুণ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে বসেই পড়াশুনা করে। কিন্তু হঠাৎ লাইব্রেরি থেকে গেল কোথায়?
লাইব্রেরিয়নই বলল,—ওহো, তোমার রোবোট দাদার কথা জানতে চাইছ? সে তো আমায় বলে গেল, যাচ্ছি রোবোট ইনস্টিটিউটে একটু কাজে। ঠিক সময়েই এখানে ফিরে আসব। হয়ত কোথাও আটকে গেছে।
চিন্তিত হয়ে ওঠে রোবোনা। সে জানে, রোবোট দাদা নবারুণ কাজ করে ঘড়ির কাঁটা ধরে। তাই সঠিক সময়ে ফিরে না আসা মানেই বিপদ। রোবোনা দ্রুত রাস্তায় নেমে আসে। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে রোবোটিক ইনস্টিটিউটের দিকে। মাঝপথে আসতেই চমকে ওঠে রোবোনা।
এ কি! ল্যাম্পপোস্টের নিচে বেআব্রু অবস্থায়, অ্যানড্রয়েডিক চেহারা নিয়ে এ কে বসে! এ যে নবারুণদা!
—এভাবে এখানে বসে কেন? কি হয়েছে তোমার? ওঠ, জামাকাপড় পড়ে ফেল। সহজ হও। বি নরম্যাল দ্রুত কথাগুলো বলে রোবোনা। বাবাই তাকে বলে গিয়েছিল, কখনও যদি দেখিস নবারুণ অদ্ভুতভাবে বিহেভ করছে, এই কথাটাই বলবি, সহজ হও, বি নরম্যাল। দেখবি, ও চট করে নিজেকে সঠিক লাইনে নিয়ে আসবে। তোর এ কথাটাও শুনতে বাধ্য তখন। মুহূর্তে মন্ত্রপূতের মত উঠে দাঁড়াল রোবোট নবারুণ। জামাকাপড় জুতো সবই পড়ে ফেলে সহজ মানুষের মত হল আবার। রোবোনার দিকে তাকিয়ে বলল, থ্যাংক ইউ সিস্টার। সত্যি, হঠাৎ বড় অসহায় হয়ে গেছিলাম।
—তোমার এ দুরবস্থা করল কে? বিস্ময়ের ঘোর তখনও রোবোনার চোখে-মুখে।
—কে আবার, তোমার দাদা, সেই বদমাস মানুষটা, মণিময়। ঐ দেখ, দূরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ঘৃণাঝরা স্বরে বলে নবারুণ।
—এ কি! তাইতো! মণিময়দাই বা অজ্ঞান হোল কি করে? জিজ্ঞাসু বিস্মিত দৃষ্টি রোবোণার।

—আমায় আঘাত করতে আসতেই আমি আমার সেফ্‌টি-ইলেকট্রো সার্কিটে নিজে ঘিরে ফেললাম। আমার রাঙা চেহারা দেখে ও ভয় পেয়ে রোবোটিক প্রথম ধারায় আমাকে বাধ্য করল জুতো খুলে, চুপটি করে ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসে থাকতে। তারপর আমাদের রোবো-হাউস রেইড করার জন্য রওনা হোল। আমি নিষেধ করতেই আমায় পাথর ছুঁড়ে আঘাত করল। আমিও তখন তৃতীয় ধারামতে, সেলফ-ডিফেন্সে, লেসার-রে ছুঁড়ে ওকে অজ্ঞান করে দিই। মনে হচ্ছে, এবার ওর জ্ঞান আসবে।

সত্যিই, মিনিট খানেকের মধ্যে জ্ঞান এল মণিময়ের। ভূশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাকাল রোবোট নবারুণের দিকে। বাঁকা হেসে বলল—ওঃ আবার দুজনে এক হয়েছ। ঠিক আছে, সোজা আঙ্গুলে যখত ঘি উঠবে না, তখন আঙ্গুল বাঁকিয়ে ঘি বার করার রাস্তাটাই দেখিয়ে দেব এবার। চলি। হনহন করে চলে যায়মণিময়।

রোবোনাও মণিময় ফিরে আসে রোবা হাউসে। রোবোনার মাথায় দুশ্চিন্তা। নবারুণের কম্পুটারিক ব্রেনে নানান চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে যায়। এক্সট্রা মেমারি সেল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আসতে শুরু করে। সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবার তাকেই বহির্প্রকাশ করে। নবারুণ বলে ওঠে। রোবোনা এবার বিপদ আসবেই। আমাদের এবার সত্যি করেই সেই বিপদকে রুখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

—বিপদ। কি বিপদ হবে দাদা ?

—পরে সবকিছু বলব রোবোনা। বাড়ি চল। এসব কথা খোলা রাস্তায় আর আলোচনা করা যায় না। নবারুণ আর রোবোণা ফিরে আসে রোবা হাউসে।

৪

এই ঘটনার দুদিনের মাথাতেই উকিলের চিঠি এল রোবোনার নামে। প্রপার্টির অর্দ্ধেক শেয়ার না ছেড়ে দিলে কোর্টের স্মরণাপন্ন হবে মণিময়। আলটিমেটম দিয়েছে।

চিঠি হাতে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে রোবাণা। রোবোট নবারুণ বলে--একথাইতো সেদিন তোকে বলতে চেয়েছিলাম রোবোণা। এই মুহূর্তে লিগাল হেল্পই দরকার। রোবোটিক অটোমাইজেশনে শত্রুকে ঠেকাতে পারি, বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচকে এড়াবার উপায় বার করতে পারি না। এর জন্য পাকা মাথার এডভোকেটের দরকার। তাদের খবর তো আমি জানি না রোবোনা। দেখ্, তুই এব্যাপারে কিছু করতে পারিস কিনা। ভাবতে বসে রোবোনা। রোবো-নবারুণ টেলিস্কোপলেন্সি-চোখে স্থির তাকিয়ে থাকে রোবোনার দিকে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় রোবোনা। উত্তেজিত ভঙ্গি।—দাদা, তোমাকে বাঁচাতেই হবে আমাকে। তার জন্য আমাকে প্রয়োজনে আত্মত্যাগও করতে হবে। বাবা-মাকে কথা দিয়েছিলাম। শত বিপদেও তোমাকে রক্ষা করব।

রক্তিম-ফ্লাশ বয়ে যায় এনড্রয়েডিক রোবো শরীরে। বোঝা যায়, রোবোনার উত্তেজনার ছোঁয়ায় দ্রুত কারেণ্ট প্রবাহ চলেছে নবারুণের অ্যানড্রয়েডিক বহির্গাত্রে।

—কি করতে চাস্ তুই! মনে রাখিস্, আমার জন্য তোর কোন ক্ষতি আমি হতে দিতে পারি না। আর রোবোটিক প্রথম ধারামতে, সেই ক্ষতির আগে, তোকে আমি বাধা দিতে বাধ্য হব।

—না, না। সেরকম ভাবনার কিছু নয়। ব্যাপারটা যা ভাবছ সেরকম নয়। আসলে ব্যাপারটা কি জান? আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, আমাদের চেয়ে কয়েকবছরের সিনিয়র, একজন ব্রাইট ছেলে ছিল। এখন এম, এ পাস করে ল-ইয়ার হয়েছে। আমাদের এডভোকেট জেনারেলের ছেলে, সিরিন. কে. নবিশ।

—সিরিন কে. নবিশ! মানুষের এরকম বিদঘুটে নাম হয় নাকি। ফ্যাঁক—ফ্যাঁক ফ্যাঁক। হেসে উঠে রোবো-নবারুণ।

—বুঝছ তাহলে, সিরিনকে কেন পছন্দ করি না। আসল নাম সৌরিন, বেঁকিয়ে চুরিয়ে তাকেই করেছে সিরিন। আর খাসনবিশ থেকে হয়েছে কে. নবিশ. এভাবেই নাম হয়েছে কিম্ভূতকিমাকার। হো-হো-হো। রোবোনাও হেসে উঠে।

—তা ছেলেটাতো ব্রাইট বলছিস। একটু আগে রোবানার বলা সব কথাই নবারুণের ইমপুট বক্স দিয়ে ঢুকেছিল সেণ্ট্রাল প্রসেসারে। তারপর মেমারি সেলে। ব্রেনের সেই রুদ্ধ ভাণ্ডার মুহূর্তে ফেরত পাঠাল কথাটা 'ব্রাইট ছেলে'। স্মৃতিকোষ আর অনুভূতির সংশ্লেষণে সেই কথাটা নবারুণকে বলে দিল, যাই বল, ছেলেটা ব্রাইট। তাই মুহূর্তে নবারুণের ব্রেনের আউটপুট বক্স দিয়ে উদ্গত হোল কথাটা—ছেলেটা ব্রাইট।" নবারুণ বলে, তাই যদি হয়, দুএকটা পাগ্লামী সহ্য করতে পারিস।

—থ্যাংক ইউ দাদা, চিন্তার হাত থেকে বাঁচালে। মনে হয়, এই বিপদের মুহূর্তে যখন আমাদের একজন ভাল ল-ইয়র দরকার, আর তাকে যখন আমাদের বিশ্বাসভাজনও অনুভূতিশীল হোতে হবে। তখন সৌরিন খাসনবিশকেই দরকার ওকে পেলে ওর বাবা এ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমিন খাসনাশিক মতামতও পাওয়া যাবে।

—সিরিন. কে. নভিশ না বলে সৌরিন খাসনবিশ বললেই সব গণ্ডোগোল হয়ে যাবে। ফ্লা—ফ্লা—ফ্লা। মিষ্টি ধাতব হাসিতে ঝরে পড়ে নবারুণ।

—যা বলেছ। রোবোনাও হাসতে হাঁসতে সায় দেয় কথাটায়।

রোবোনা তখনুই ফোন করে সরিন নভিশকে। বলে—সরিন, জরুরী দরকার। যদি একবার আমাদের বাড়িতে আসতে।

এই প্রথম রোবোনার ফোন পেয়ে খুশীতে চঞ্চল হয়ে ওঠে সরিন· কে· নভিশ। বলে,—সিওর, যাচ্ছি এক্ষুনি। হোয়াট এ সারপ্রাইজ।

সরিন নভিশের সংগে দীর্ঘ কথা হোল রোবোনার। বলল রোবোনা—সরিন, আমার এই রোবোট দাদাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বাবা আমাকে। দাদা নবারুণের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, অর্থ আছে! যা আছে তা আমাদের অনেক অনেকের চেয়ে বেশি। কিন্তু তবু রোবোট মানুষ নয় বলে মানুষী অত্যাচার মাঝে মাঝেই দাদাকে সহ্য করতে হয়। তাইতো দাদাকে ছেড়ে তোমার মত ছেলেকেও বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি না। সেজন্যইতো এতদিন এড়িয়ে এসেছি তোমায়।

—কেন, তোমার এই রোবোট দাদাকে কি আমিও ভালবাসতে পারি না রোবোণা? প্রশ্ন করে স্নিগ্ধ আবেগে সৌরিন খাসনবিশ।

—পারবে না কেন? তবে তোমার সংগে চলে গেলে, এই নির্বান্ধব পুরীতে কে থাকবে রোবো-দাদা নবারুণের পাশে? সেই সময় মণিময়দার মত মানুষেরা এসে যদি দাদার ওপর হামলা চালায়? দেখছ না বাবা, সব কিছু দিয়ে গেছেন নবারুণকে। আমার তাতে অমত নেই। অথচ মানুষী কানুনের অক্টোপাশ কেমন জড়িয়ে রেখেছে সবকিছুকে, তার জন্য পর্যন্ত মণিময়দা এই সম্পত্তির লোভে আমাদের উকিলের চিঠি দিয়েছে।

—হুঁ, ব্যাপারটা ঝমলার তো বটেই। মানুষ যন্ত্রকে ভালবাসতে পারে, সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নিতে পারে। কিন্তু যন্ত্র-যন্ত্রই। যন্ত্র কি করে পাবে মানুষের সব অধিকার? কিছু অজড় যান্ত্রিক পদার্থকে কৃত্রিম তড়িত প্রবাহে চালু করলেই তো সত্যি সে মানুষ হয়ে যাচ্ছে না? সরিন· কে নবিশ· উকিলি ঢঙে কথাটা উচ্চারণ করে।

—কি বলছ সরিন! নবারুণদা শুধু কিছু অজড় যান্ত্রিক পদার্থের কৃত্রিম যন্ত্র সঞ্চালন! অনুভূতি, সুখ-দুঃখ-বেদনা এসব জড় পদার্থের থাকে? বিবেক-বোধ থাকে তাকিয়ে দেখ নবিশ তোমার কথায় নবারুণদার গোলাপী চেহারা কেমন কালচে হয়ে গেছে। মুখটা কেমন বেদনার্ত? কৈ, একটু আগে তো এ চেহারা ছিল না নবারুণদার। বল সরিন, মানুষী এরকম অনুভূতি যার আছে, তাকে যন্ত্র বলে এড়িয়ে যেতে পার? আবেগে থরথর করছে রোবোনা।

—রো-বোনা, প্লিজ, ভুল বুঝ না আমায়। তুমি সায়েন্সের ছাত্রী। সেন্টি-মেণ্টাল হওয়া তোমার সাজে না। আর আমি যখন আইনী কাজ করি আমি তো যুক্তি-তথ্য-তত্ত্বভিত্তিক কথাই বলব। আমাদের সমাজের কাঠামো

আইনের বাঁধনে বাঁধা। আমি যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব দিয়েই বুঝতে চাইছি তোমাদের কতটা সাহায্য করা সম্ভব। আইন বড় কঠিন কঠোর রোবোনা।

—তা বলে অন্যায়কেও প্রশ্রয় দেবে আইন? বাবা নবারুণদাকে "রোবো-হাউসের", তার রিসার্চ ল্যাবোরেটরির সব দায়দায়িত্ব দিয়েছেন, সে কি অন্যায়? রোবোট-সিস্টেমের যত উন্নতি হয়েছে তার মূল অবদান কি নবারুণদার নয়? বিজ্ঞান জগতে রোবোট নবারুণের দান যে কোনও বিজ্ঞানীর চেয়েও কি কম?

—নাঃ, নাঃ, সে কথা বলছি না। আমরা সবাই জানি, নবারুণই প্রথম স্বাধীন প্রায় মানুষী রোবোট। ক্ষমতাবান যন্ত্র হলেও মানুষের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আইন তো তাকে মানুষ বলবে না। বুঝতে চেষ্টা কর রোবোনা, আইন-সহায়ক কি পয়েন্টস আছে আমাদের, যার জোড়ে, ডঃ সত্যশংকর জোয়ার-দারের একমাত্র ভাইপো মনিময়ের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র ঠেকাতে পারি?

—তাই বলে ঐ অপদার্থ, অর্থলিপ্সু মানুষের হাতে পরে রোবো-হাউসের সব জ্ঞান-সম্পদ তছনছ হয়ে যাবে? নবারুণদা কোন কিছু তো ভোগ করে না, বরং আমাদের সমাজকেই সব দিয়ে যাচ্ছে। নিজের অর্জিত অর্থেই রোবো-ল্যাবোরেটরিকে বাড়িয়ে যাচ্ছে, আধুনিকতম করে গড়ে তুলছে। আইন কি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না?

—রোবোনা, তোমার কথাগুলোয় এই প্রথম কিছু পয়েন্টস্ পেলাম যা নিয়ে বাবার সংগে পরামর্শ করতে পারি। বিজ্ঞান যেখানে সমৃদ্ধ হচ্ছে, সমাজ সেই বিজ্ঞান থেকে যদি সত্যিই লাভবান হয় তখন আইন হয়ত তাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে পারে? তবে তার জন্য যোগ্য আইনধারা কি, সেটাই খুঁজে বার করতে হবে।

—ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ সরিন। সত্যিই তবে কিছু আশার আলো দেখাচ্ছে? নবারুণদা, মনে হচ্ছে হয়ত কিছু একটা হবে। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে রোবোনা।

—থ্যাংক ইউ স্যার। আই অ্যাম গ্রেটফুল। আইনের কোন ধারায় আপনারা লড়তে পারেন হয়ত দু-একদিনের মধ্যে আপনাকে জানাতেও পারব। রোবোট নবারুণ কৃত্রিম মানুষী আঙ্গুলে সৌরেন খাসনাবিশের হাতটা জড়িয়ে বলে ওঠে।

—মাই গড! নবারুণ যে ঠিক মানুষেরই মত রিঅ্যাক্ট করে কথা বলছে! অবাক হয়ে বলে সৌরিন।

—চমকিয়ো না সরিন। দুদিন পরে এসো দেখবে নবারুণদাই আইনের ধারা-গুলো তোমায় দেখিয়ে দেবে। মুচকি হেঁসে বলে রোবোনা।

—বাট্ হাউ! আইন পড়েছি আমি। আইন গুলে খেয়েছে আমার বাবা।

আমরা যদি আইনের ধারা বার করতে হিমসিম খাই, তবে রোবোট নবারুণ তা দুদিনে খুঁজে বার করে দেবে ? কিছুটা উষ্মা সৌরিন খাসনবিশের গলায়।
—মাই ফ্রেন্ড, তোমাদের পড়তে যেখানে আধ ঘণ্টা লাগে সেখানে মাইক্রোস্কোপিক চোখে আমাদের মুহূর্তে কথাগুলো গাঁথা হয়ে যায় আমাদের মেমারি সেলে। আশা করি দুদিনে তোমাদের আইনের এই সব অনেকিছুই পড়া ও গাঁথা হয়ে যাবে আমার মস্তিষ্ককোষের ভাণ্ডারে। আর তখন সঠিক পয়েন্টস খুঁজে বার করতে কোন সময়ই লাগবে না আমার। আমরা যে মানুষের চেয়ে সহস্রগুণ দ্রুততর, লক্ষগুণ নিখুঁত, অভ্রান্ত। গম্ভীর ধাতব স্বর নবারুণের।
—নবারুণ, ডোণ্ট ওরি। আমি কথা দিচ্ছি আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমার জন্য, তোমাদের জন্য। আমি তোমারও বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী। নবারুণের পিঠে বন্ধুত্বের হৃদ্য স্পর্শ রাখে সৌরিন।
—ধন্যবাদ। নবারুণ জোয়ারদারও তোমায় মনে রাখবে। তোমারও বন্ধু হল আজ থেকে এই রোবো মানুষ নবারুণ।
সুখী আনন্দে, খুশীর ঝলকে ঝিকমিক করতে থাকে রোবো-হাউস, রোবো-হাউসে বসে থাকা মানুষ সৌরিন খাসনবিশ, রোবোনা জোয়ারদার আর রোবো-মানুষ নবারুণ।

৫

এক বছরের মাথায় কোর্টে কেস উঠল। রোবোট নবারুণের বিরুদ্ধে কেস। বাদী সত্যশংকর জোয়ারদারের ভাইপো মণিময় জোয়ারদার। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কেস। রোবো-হাউস, তায় ল্যাবোরেটরি আর সত্যশংকরের সমস্ত টাকার দাবী করেই মণিময়ের কেস।
কোর্টে ভিড় উপচে পড়ে প্রতিদিন। বিস্ময়কর কেস। যন্ত্র মানব রোবোট নবারুণকে ডঃ সত্যশংকর তার সম্পত্তি বাড়িঘর ল্যাবোরেটরি সর্বকিছুর একমাত্র অছি করে গেছেন। মণিময়ের আর্জি, যন্ত্রমানব নবারুণ এই উইল করিয়েছে ডঃ সত্যশংকরকে ভয় দেখিয়ে। মানুষের সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে তারই বংশজ কেউ, যন্ত্র নয়। রোবোট নবারুণ মানুষের ভৃত্যতুল্য, হাতের পুতুলের মত। মানুষের ইচ্ছাতে সে চলবে। তার নিজস্ব সত্তা নেই, থাকতে পারে না। সে সম্ভাবনা অবাস্তব।
কেস উঠেছে হাইকোর্টে। জাজ সুবর্ণ চক্রবর্তী, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ মানুষ বলেই খ্যাত। সুবিচার বলতে যা বোঝায় সুবর্ণ চক্রবর্তী তাই-ই করেন।
মণিময়ের এডভোকেট সুহৃদ পাঠক প্রশ্ন করলেন—মিস্ রোবোনা, আপনিই তো রোবট নবারুণের মুখ্য সাক্ষী ?
—হ্যাঁ। ধীর গলায় বলে রোবোনা।

—আপনি কি বলবেন, স্বর্গত ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের একমাত্র সন্তান হয়েও কেন আপনি সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন? বেশ কঠোর গলা এডভোকেট সুহৃদ পাঠকের।

—আমি তো কোনওভাবে বঞ্চিত হইনি। আমি ও নবারুণদা দুজনেই বাবার সন্তান। নবারুণদা বাবার সৃষ্টি। আর নবারুণদার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকেই ডাক্তারদের অপারেশনের ফলে, আবার স্বর্গত মা অনুপ্রভার গর্ভে আমার জন্ম হয়। আমরা জোয়ারদার পরিবার, তাই নবারুণদার কাছে ঋণী। সেজন্যই বাবা সম্পত্তির অছি করে গেছেন নবারুণদাকে। শান্ত কণ্ঠে বলে রোবোনা।

—যন্ত্র আপনাকে হুকুম চালাচ্ছে, আপনার সম্পত্তি অধিকার করে বসে আছে, তার জন্য আপনি ক্ষুব্ধ নন? তীক্ষ্নকণ্ঠ মণিময়ের এডভোকেট পাঠকের।

—অধিকার করেছে কোথায়? বরং যমের ধনের মত সবকিছু পাহারা দিচ্ছে নবারুণদা। নবারুণদাই কত রোজগার করে। সেসব টাকাই বরং খরচ করার অধিকার আছে আমার, আর আমি করিও তা।

—কিন্তু ওকে নবারুণই বলুন আর মানুষই ভাবুন, ওতো রোবোট ছাড়া কিছু নয়। বলুন মিস্ রোবোনা, বাইরে থেকে মানুষের মত দেখতে হলেও সত্যিই কি সবকিছু ওর মানুষের মত?

—হ্যাঁ, প্রায় সবটাই মানুষের মত। দ্রুত উত্তর দেয় রোবোনা।

—না মিস্ রোবোনা, সবকিছুই মানুষের মত নয়। বলুন, আমাদের হার্ট যেমন ধুকধুক করে সেরকম হৃদযন্ত্র আছে ঐ রোবোট নবারুণের? পালস্ বিড্ আছে? শিরা-উপশিরা রক্তপ্রবাহ আছে? প্রায় ধমকেই ওঠেন এডভোকেট পাঠক। কি? চুপ করে কেন? উত্তর দিন?

—না, সেসব নেই—। তবে—

—শুধু কি তাই। আরও তফাত আছে। নারী-পুরুষের যা প্রভেদ সেই প্রভেদ কি আছে রোবোট নবারুণের? যদি থাকত, তবে সেদিন রাস্তায় যখন ঐ রোবোট জামা-প্যান্ট খুলে উলঙ্গ অবস্থায় বসেছিল, তখন কি আপনি ওর দিকে তাকাতে পারতেন? বলুন?

নিশ্চুপ হয়ে মাথা নিচু করে থাকে রোবোনা। কথাটাতো সত্যিই। রোবোট নবারুণ তো আর সত্যিই সম্পূর্ণ মানুষ নয়। তাহলে এইসব জৈবিক ব্যবস্থাদি পাবে কোথা থেকে?

—জ্ঞানভাণ্ডার যার বেশি থাকবে সেই-ই মানুষ হয়ে যাবে? তা কি হয়? তাহলে ইতিহাস বিজ্ঞানের বই, বুক-অফ-নলেজ এদেরও তো মানুষ বলা যায়।

—না যায় না। ওরা তো নড়াচড়া করে না, কথা বলে না। নবারুণদা কথা বলে, কথা বোঝে ওর। অনুভূতি আছে, বিবেক দয়া-মায়া সব আছে। কিন্তু

মানুষ হয়েও অনেকেরই তা নেই। তাই নবারুণদা খাঁটি মানুষ বৈকি। উত্তেজিত কণ্ঠ রোবোনার।

—গ্রামোফোনও কথা বলে। গান করে। তা বলে ওটা কি মানুষ?

—না, নয়। কারণ ওর অনুভূতি নেই, বিচার-বুদ্ধি নেই। কিন্তু নবারুণদার আছে।

জাস্টিস্ সুবর্ণ চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন—মিস্ রোবোনা, আপনি রোবোট নবারুণকে গার্জেন হিসাবে পেয়ে সেফ মনে করছেন কি?

—ইয়েস্ মাই লর্ড। নির্দ্বিধায় উত্তর করে রোবোনা।

—মিস্ রোবোনা, ধরুন আপনার গার্জেন হিসাবে রোবোট নবারুণের জায়গায় আপনার খুড়তোতো ভাই মণিময় জোয়ারদারকে যদি সেই অধিকার দিই? আবার প্রশ্ন করেন জাস্টিস্ চক্রবর্তী।

—মাই লর্ড, যদি তাই হয়, তবে বুঝবে আপনার মত ন্যায় বিচারকও সুবিচার করলেন না।

—কেন একথা বলছেন? মানুষ কি যন্ত্রের চেয়ে যোগ্যতর নয়? জাস্টিস্ চক্রবর্তী খুব ধীরে ধীরে প্রশ্নটি করেন।

—মানুষ অযোগ্য একথা বলছি না, বলছি মণিময় জোয়ারদার আত্মীয় হলেও অযোগ্য। রোবোট নিয়েই চলছে রোবো-হাউসে রিসার্চ। এ বিষয়ে যার জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, রোবোটের ওপর ভালবাসা নেই, সে কি করে রোবোট নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে? বাবা তাঁর সম্পত্তি ল্যাবোরেটারি সব কিছু রেখে গেছেন বেচে দেবার জন্য নয়, তাকে বিদ্যায় বুদ্ধিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধতর করে তোলার জন্য।

—মিস রোবোনা, আপনি কি করে বুঝলেন মণিময় জোয়ারদারের রোবোটের ওপর ভালবাসা নেই! জাস্টিসের দ্রুত প্রশ্ন ভেসে আসে।

—মাই লর্ড, এর উত্তর নবারুণদাই দেবে।

—রোবোট নবারুণ দেবে! বিস্মিত হন জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তী। ঠিক আছে, রোবোট নবারুণ আসুক উইটনেস্ বক্সে।

—রোবোট নবারুণ, মানুষের মত বুঝে-শুনে কথা বলার ক্ষমতা আছে তোমার। তাই প্রশ্ন করছি, কেন তুমি ভাবছ, মণিময় জোয়ারদার তোমাকে মানে রোবোটদের অপছন্দ করে?

—মাই লর্ড, আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে চাইবেন সুন্দর করে রাখতে। যেমন দেখুন, ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার শুধু আমায় সৃষ্টিই করেন নি, আমি যাতে দেখতে সুন্দর হই সেজন্যই অনড্রয়েডযুক্ত বডি বানাতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তারই ফলে মানুষের মত দেখতে হয়েছি। রোবোটিক ২নম্বর ধারা থেকে আমায় মুক্ত করে গেছেন, যাতে আমি নিজ চিন্তাভাবনায় চলে,

রোবোট বিষয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করতে পারি। শুধু কি তাই, আমার মানুষ করবার জন্য মানুষের মত জামা জুতো প্যান্ট পরবার অধিকারও দিয়েছিলেন ডঃ সত্যশংকর। এই ভালবাসায়, আমি আমার অনুভূতির সংগে পরিপার্শ্বিক অবস্থার জারনে রোবোটবিষয়ে বহুতর বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কার করেছি। এইসব দিয়ে আমি বুঝেছি, ডঃ সত্যশংকর পিতার ভালবাসায়, অনুপ্রভা মায়ের মমতায় আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এখন যেমন রোবোনা আমাকে ভালবাসে ঠিক দাদার মত। এসব ভালবাসা আমি বুঝতে পারি মাই লর্ড।

—কিন্তু মণিময় জোয়ারদার ভালবাসবে না সেটাই বা বুঝছ কেমন করে?

—লর্ড, যদি মণিময় সত্যিই আমাকে ভালবাসত তবে, রাস্তায় আমায় বিরাস্ত্র করতে বাধ্য করত না। আমায় উলঙ্গ হয়ে ল্যাম্পপোটের নিচে বসে থাকতে আদেশ দিত না। আবার পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে চেষ্টা করত না। মণিময় ডঃ সত্যশংকরের সম্পত্তি চায়, ল্যাবোরটারির দখল চায়, তাকে বেচেবুচে পয়সা-কড়ি নিয়ে বিদেশে পালাবে বলে।

—বুঝলাম, মণিময় তোমায় পছন্দ করে না। হোতে পারে। কিন্তু সবকিছু বেচে যে বিদেশে পালাবে এটাতো তোমার কল্পনাও হতে পারে।

—মাই লর্ড, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আমি যন্ত্র, কল্পনা তাই আর যে করে করুক। আমার মত যন্ত্ররা করে না। আমি কাজ করি, কথা বলি, তথ্য-ভিত্তিক, দেখুন। আমার এই গ্রাফিক ছবি, এতে কার মনে কি কথা ভেসে উঠছে, তারই ছবি ধরা পড়ছে। একে নাম দিয়েছি "থটোস্কোপ"। কথাটা বলেই নবারুণ জামার পকেটে রাখা চ্যাপ্টা ধরনের পকেটবুকের মত ছোট যন্ত্র বার করল। তাতে নানান কথা লেখা। ডাইরীর পাতার মত ছোট ছোট পাতা উল্টে বার করল একটা পাতা। মাথায় ছোট করে তারিখ ছাপা। দেখুন স্যার। থটোস্কোপের রিপোর্ট। থটোস্কোপটা এগিয়ে দেয় নবারুণ।

—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব লেখা। পড়তে পারছি না কিছুই, বলেন জাস্টিস সুবর্ণ।

—স্যরি সার, এলেখা খালি চোখে দেখা মুস্কিল। আমি আমার টেলিস্কোপিক চোখে দেখতে পাই। কিন্তু মানুষরা পারবে না। এর জন্য মাইক্রোস্কোপ চাই, বলে নবারুণ।

—ওকে! এটা এক্সিবিট হিসাবে থাক। কাল আসবে একটা মাইক্রোস্কোপ। তখন পরীক্ষা হবে। আজ শুনানী এখানেই মুলতুবী থাকছে।

পরেরদিন মাইক্রোস্কোপের তলায় লেখাগুলো পড়লেন জাস্টিস সুবর্ণ চৌধুরী চমকে উঠলেন। —তাইতো! লেখা আছে, আঃ একবার সব দখলে পাই, সব বেচেবুচে পালাব আমেরিকায়। কিন্তু মুস্কিল বাধাচ্ছে রেবোট। যে ভাবেই হোক ওকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। এককোণে মণিময়ের ছবি।

জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তী বলেন—এটা যে ওর মনের কথা, তার প্রমাণ কি নবারুণ ?

—ক্লিক, ক্লিক। হেসে ফেলে নবারুণ। স্যার, থটোস্কোপের ওপরের পাতাটা উল্টান। আজকের ছবি ওতে ফুটছে। যন্ত্রটা তো আমি সবসময়েই চালু রাখি। দেখে নিন, আপনি যা ভাবছেন, তাই-ই কি ওতে ফুটে উঠেনি ?

জাস্টিস্ চক্রবর্তী দ্রুত পাতা উল্টান। ওপরের পাতাটা মাইক্রোস্কোপের তলে রেখেই চমকে ওঠেন। আরে সর্বনাশ ! নবারুণ, একি বানিয়েছে ! সত্যিই তো, যা ভাবছি হুবহু তাই-ই লেখা এতে ফুটে উঠেছে ! ওয়েল ডান নবারুণ। বুঝলাম, মণিময় জোয়ারদারকে নিয়ে যা বলেছ তা সত্যি। কিন্তু তবুও, মানুষের বদলে যন্ত্র কি সম্পত্তির অধিকারী হয় ?

এই প্রথম নিশ্চুপ থাকে নবারুণ। তারপর ধীরে ধীরে বলে—আমার আইনজ্ঞ সরিণ. কে. নভিশই এর উত্তর দেবেন মাই লর্ড। মানুষের গড়া সমাজের কথা মানুষী আইনজ্ঞই ভাল বলবেন। অ্যাডভোকেট সৌরিন খাসনবিশ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—মাই লর্ডসিপ, সাক্সেসন নিয়ে প্রশ্ন যখন, তখন উইটনেস বক্সে মণিময় জোয়ারদারকে ডাকা হোক্। কারণ উনিই তো বাদী।

মণিময় উইটনেস্ বক্সে এলো। সরিন্ স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল —বলুন তো মণিময়বাবু, এই সম্পত্তি যদি পান, কি করবেন তাকে নিয়ে ?

হঠাৎ এভাবে কথাটা আসায় চম্‌কে ওঠে মণিময়। আমতা আমতা করে বলে, —রোবোট নিয়ে রিসার্চ যাতে ভাল চলে তার ব্যবস্থা করব।

হেসে ফেলে সরিন। বলে—কিন্তু সেই রিসার্চ কি করে করবেন ? কাকে দিয়ে করাবেন ?

রুখে উঠে মণিময়। —কেন, রোবো রিসার্চ ইনটিটিউটে যাব। তাদের দিয়েই সব করাব।

আবার হাসে সরিন। বলে, —কিন্তু মণিময়বাবু একথা কি জানেন, সেই রোবো রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চীফ অ্যাডভাইসার কে ?

—না, তা জানি না। তবে জেনে নেব, এটাতো সহজ ব্যাপার। দ্বিধান্বিত স্বর মণিময়ের।

—তবে স্বীকার করছেন এটুকু, রোবো রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাহায্যেই রিসার্চ করবেন রোবোট নিয়ে, তাইতো ?

—সিওর। দ্রুত উত্তর দেয় মণিময়।

সরিন. কে. নভিস্ এবার ঘুরে দাঁড়ায় জাস্টিস সুবর্ণর দিকে। বলে—মাই লর্ডসিপ আমাদের বন্ধু শ্রী মণিময় অনেক কিছুই জানেন, কিন্তু এটুকু জানেন না যে এই রোবো রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মুখ্য উপদেষ্টা হচ্ছে এই রোবোট নবারুণ জোয়ারদার। রোবো রিসার্চ ইনস্টিটিউটে "রোবো বায়লজির" ওপর যে

বই একমাত্র গাইড বই হিসাবে প্রচলিত, দামী, নিত্য ব্যবহার্যের বই, তা এই রোবোট নবারুণেরই লেখা। স্যার দেখুন তাহলে রোবোট নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হলে একমাত্র স্বাধীন রোবোট নবারুণকে বাদ দিয়ে কি তা করা সম্ভব ?

নিশ্চুপ থাকেন জাস্টিস সুবর্ণ। তারপর জাস্টিস সুবর্ণই প্রশ্ন করেন মণিময়কে —বলুন মণিময়বাবু নবারুণ-রোবটোকে বাদ দিয়ে কি করে রোবোটের ওপর রিসার্চ চালাবেন। রোবোট-বিষয়ক রিসার্চের দায়িত্ব তাই রোবোট নবারুণের ওপর অর্পণ করে স্বর্গত ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদার কি অন্যায় করেছেন ? না আজ সে অধিকার কেড়ে নেওয়া বিজ্ঞানের স্বার্থে উচিত ? চুপ করে থাকে মণিময়। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এই কঠিন সত্যকে অস্বীকার করার উপায় কোথায় তার ?

—কী ? বলুন, চুপ করে আছেন কেন ? তাড়া লাগান জাস্টিস সুবর্ণ।

—মাই লর্ড, এবার আমি কি দু-একটা প্রশ্ন করতে পারি ? আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন সৌরিন খাসনবিশ, নবারুণের এডভোকেট।

—ইয়েস্ প্রসিড।

—আক্সেসন রুলের মূলকথা কি এটাই নয়, যাঁর সম্পত্তি, তিনি যাকে বিশ্বাস করে সেই সম্পত্তি দিয়ে যাবেন তিনি যোগ্য বিবেচিত হলে, সে অধিকার তাঁর থেকে আইনের কেড়ে নেওয়া ন্যায় সুবিচায় নয়।

—প্রসিড। সুবর্ণ চক্রবর্তী বলেন।

—মাই লর্ডসিপ, দেখুন তাহলে, এ ক্ষেত্রে রোবোট হলেও নবারুণ মানুষের মতই কি বিশ্বাসভাজন, যোগ্যতম নন ? নবারুণের হাতে রোবো-হাউস, রোবোবিষয়ক রিসার্চ, রোবোনার শিক্ষা পরিচর্যা, সুখ-সুবিধার কিছুমাত্র কি ত্রুটি ঘটেছে ? না বরং নিখুঁত নিয়মে এসব পরিচালিত হচ্ছে। বলুন তবে মাই লর্ডসিপ, নবারুণ কেন তার প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে রক্তের সম্পর্কই কি শেষ কথা ? প্রতিদিনের সংস্পর্শে যে প্রীতি-ভালবাসা আসে সে কি মিথ্যে হয়ে যায় ? উত্তেজিত কথার শেষে থামে সৌরিন খাসনবিশ।

—এনি মোর পয়েনটস ? জাস্টিসের ভারী গলা আবার ভেসে আসে।

—মাই লর্ডশিপ। আপনার ন্যায় দরবারে এই আমার শেষ আবেদন, জ্ঞান সমুদ্রের মন্থন, জ্ঞানীর হাতেই অর্পণ করুন। আর এটাও আপনি দয়া করে আদেশ দিন, রোবোটের যেমন মানুষকে আঘাত করার অধিকার নেই, তেমনি লোভী মানুষও অন্যায় ভাবে যেন মানুষের উপকারী বন্ধু রোবোট নবারুণকে আঘাত করতে না পারে। নবারুণের ৬৩ বছরের ইতিহাসে একটা ঘটনাও নেই যেখানে সে মানুষের কোনও অপকার করেছে। বরং মানুষের উপকারী বন্ধু হয়ে উঠছে দিনে দিনে। তাই এই নবারুণকে রক্ষার দায়িত্বও এই মহামান্য আদালত যেন জারী করেন, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

দীর্ঘ কয়েক মাসের কঠিন বাকবিতণ্ডা, উকিলি কলাকৌশল শেষে কোর্টের রায় বেরোয়। জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তী রায় দেন—রোবট হলেও নবারুণ সৎ মানুষের মতই বিশ্বস্ত, উপকারী ও জোয়ারদার পরিবারের মান মর্যাদার রক্ষক তাই ডঃ জোয়ারদারের উইলমতে নবারুণই সব কিছুর রক্ষণা-বেক্ষণের অছি হিসাবে থাকতে পারে, যতদিন রোবোনা জোয়ারদার এ বিষয়ে কোনও আপত্তি না জানাবে। এ ছাড়াও কোর্ট আদেশ দিচ্ছে, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোনও মানুষ নবারুণের ক্ষতিসাধন করলে বা করবার প্রচেষ্টা করলে, আইন অনুসারে, মানুষের ক্ষতি করার জন্য যে সাজা হয়, সে সাজাই সেই দুষ্কৃতকারী মানুষ পাবে। কোর্ট শেষ হয়। জাস্টিস সুবর্ণ চলে যান বিশ্রামের জন্য এ্যাণ্টিরুমে। আনন্দে খুশীতে নবারুণকে জড়িয়ে ধরে রোবোনা। দাদা, দেখলি তো আমাদেরই জয় হোল। মানুষ আর যন্ত্র কেমন একাত্ম হয়ে গেল আজ।

নবারুণ মিষ্টি হাসল, হি-হি-হি। তারপর আস্তে আস্তে জাজেস রুমের কাছে এসে বলল—আসতে পারি স্যার।

—কে! চমকে উঠলেন জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তী।

—স্যার, আপনার কাছে সমস্ত রোবোট সমাজের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ রোবোটকে রক্ষার জন্য যে অধিকার দিলেন, ইতিহাস একদিন বলে দেবে এই অধিকার কত অমূল্য। নিচু হয়ে হাতজোড় করে নবারুণ বিনম্রতায়।

—নাঃ, নাঃ, যা ন্যায় তাইতো করেছি। ব্যস্ত হয়ে বলেন জাস্টিস সুবর্ণ।

—সৎ মানুষই সত্যকে স্বীকার করে, মর্যাদা দেয়। আমি কৃতজ্ঞ। জাস্টিস সুবর্ণ তাকিয়ে দেখে রোবোট নবারুণের টেলিস্কোপিক চোখের সামনেটা কেমন যেন ঝাপসা, যেন আনন্দের আবেগ সেখানে টলমল করছে।

বায়োনিক নবারুণ

রোবোট নবারুণ মানুষী অধিকার পাবার পর রোবোনা আর সৌরিন খাসনবিশ বড় খুশী। রোবো-হাউসে এর জন্য একদিন স্পেশাল খাওয়া-দাওয়াও হয়ে গেল। কিন্তু ঝামেলা বাধল রোবোট নবারুণকে নিয়েই। আনন্দ-উচ্ছল, চট্‌পটে সদাই কর্মব্যস্ত রোবোট-নবারুণ এখন যেন কেমন ম্রিয়মাণ, ধীর-স্থির হয়ে গেছে।

শেষে রোবোনা একদিন বলেই ফেলল—নবারুণদা কি, হোল তোমার? এত চুপচাপ কেন? তুমি কোর্টে জিতে মানুষী অধিকার পেলে, অথচ তুমিই খুশী নও? ব্যাপার কি?

—না, না, খুশী নয় কে বলল? রোবোনা, তুই আর সরিন না লড়লে আমি এ অধিকার পেতামই না। এজন্য তোদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু—

—কিন্তু কি নবারুণদা? এরপর আর কি নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে? রোবোনা ক্রমেই অবাক হয়ে যায় নবারুণের হাবভাব দেখে।

—মনে নেই বোন, কোর্টে যখন তোকে জেরা করছিলেন মণিময়ের এডভোকেট শ্রীপাঠক, তখন কি কঠিন সত্যকে মেলে ধরেছিলেন?

—কি প্রশ্ন! বুঝতে পারছি না। বিস্ময় রোবোনার গলায়।

—আহ্‌ রোবোনা, তোরা, মানে মানুষেরা বড় দ্রুত সব ভুলে যাস। এজন্যই মানুষদের অগ্রগতি আমাদের মত রোবো-মানুষদের চেয়ে ধীরে হচ্ছে। বলেন নি পাঠক, মানুষের যেমন হার্ট ধুক্‌পুক্‌ করে, পলিস-বিড্‌ আছে, সেসব রোবোট নবারুণের আছে কি না? নারী-পুরুষের জৈবিক প্রভেদ যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, রোবোট নবারুণের তা নেই কেন? কারণ, নবারুণ যন্ত্র, মানুষ নয়। কি, মনে পড়ছে কথাগুলো? টেলিস্কোপী-চোখে রোবোনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নবারুণ।

—নাই থাকল, তা বলে তুমি মানুষের সমকক্ষই। কথাটা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায় রোবোনা।

—সমকক্ষ, আর, রোবোট-নবারুণ মানুষই, দুটো এক নয় রোবোনা। আর ঠিক এজন্যই মানুষেরা ছলে-ছুতোয় বারবার আমাকে আঘাত করবে। কতবার তুই আর সৌরিন আমাকে বাঁচাবি বল? বড় ম্লান, টিমটিমে ধাতবকণ্ঠ নবারুণের।

—কথাটা নির্মম হলেও, সত্য রোবোনা। এই প্রথম সৌরিন খাসনবিশ কথা

বলল, দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পরে। নবারুণ জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতায়, যে দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে, তাতে ক্রমেই শংকিত হয়ে উঠছে বন্য মানুষই। এমন কি বহু বিজ্ঞানীও নবারুণের ওপর খুশী নয়।
—কি বলছ সরিন! তা কখনও হয়! অবাক বিস্ময় রোবোনার গলায়।
—সত্য বড় নিষ্ঠুর রোবোনা। কিন্তু তবুও কথাগুলো সত্যিই। নবারুণের কেস্ লড়বার সময় যখন নানান্ বিজ্ঞানী জ্ঞানী-গুণীর পরামর্শ মতামত নিই, তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। নবারুণকে আরও নিখুঁত হতেই হবে, যদি সত্যিই মানুষ হতে যায়!
—থ্যাংকস্ সরিন। ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছ। কারণ তুমি এডভোকেট, তথ্যভিত্তিক মানুষ, তাই। খাঁটি মানুষ হবার জন্যই চলছে আমার চিন্তা-ভাবনা। এই সব ত্রুটি কাটাতেই হবে।
—নবারুণদা! কি বলছ! মানুষের মত তোমার হার্ট ধুক্‌পুক করবে! নাড়ী চলবে! নারী-পুরুষের জৈবিক প্রভেদ সৃষ্টি করবে তোমার দেহে! পারবে করতে এসব? এসব করা সম্ভব!
—করতেই হবে বোন। রক্তপ্রবাহ আনতে হবে দেহে। শুধু তাই নয়, আরও আছে। তোদের যেমন ডাক্তার ইনজিনিয়র, উকিল-ব্যারিস্টর, বিজ্ঞানী, কর্মী, অধ্যাপক, সব আলাদা আলাদা মানুষ রোবোটরাও তেমনি কেন আলাদা আলাদা হবে না? রোবোট জগৎ কেন গড়ে উঠবে না?
—কি লাভ তাতে? তোমার ব্রেন সেণ্টারে সব জ্ঞানই তো সঞ্চিত আছে। কাজও তো চলছে। নবারুণকে বোঝাতে চায় রোবোনা।
—না, সব জ্ঞান সঞ্চিত নেই। যদি তাই থাকত, তবে উকিলি পরামর্শের জন্য সরিন নভিশের সাহায্য এত দরকার হোত না। তুইই ভাব, আমার পসিট্রনিক ব্রেনের একটা ধারণ ক্ষমতার সীমা আছে। তার চেয়ে বেশি কিছু তাতে সংযোজন করতে গেলে ব্রেন ফ্যাটিগ হয়ে কাজ করবে না। আর সেখানে যদি, বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক পসিট্রনিক ব্রেন থাকে, যেমন যার একটাতে থাকবে ডাক্তারি জ্ঞান, অন্যটায় ইনজিনিয়ারিং, কোনটায় আইন-কানুন-ফলাফল আবার অন্যটায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা তার ভবিষ্যত চিন্তা-ভাবনা।
—তাতে সুবিধে কিছু হবে নবারুণদা?
—হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তুই-ই ভাব রোবোনা ধর আমি আমার শরীরে, নতুন পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে চাই, তখন মানুষী-ডাক্তারের, সার্জেনের সাহায্য নিতে হবে। প্রথমে আমি কি করতে চাই, কেমন করে করতে চাই বোঝাতে হবে মানুষী সার্জেনকে। সে তখন স্রেফ যন্ত্রের মত সেই কাজ করবে। প্রয়োজনে, কিছু রদবদল করবার বুদ্ধিও থাকবে না, আর করবেও না। সেখানে আমি যদি রোবোটিক-সার্জেনকে সব বুঝিয়ে দিই, যদি বলে দিই প্রয়োজনে সব

সেফটি মেথডস্ নেবে, মানুষের চেয়ে কি দ্রুত নিখুঁতভাবে এই রোবো-সার্জেন তা করতে পারবে না ?

—না, মানে, হয়ত পারবে ? দ্বিধা রোবোনার গলায়।

—এরপর দেখ রোবো ইনজিনিয়ারের কথা। যে ধরনের রোবোটের চাহিদা, রোবোটিক-ইনজিনিয়ার সঠিক তাই বানাবে। কিন্তু মানুষী ইনজিনিয়ার তেমনটি পারবে কোথা থেকে ? কি চাই, কেন চাই, এসব বুঝতেই যে মানুষী ইনজিনিয়াররা বহু সময় অপচয় করে ফেলবে।

—হয়ত কথাটা একেবারে ফেলনা নয়। তবুও দ্বিধা রোবোনার গলায়।

—বুঝতে পারছি, সব কিছু মেনে নিতে তোর মন চাইছে না। বেশ, সামনেই রয়েছে আমাদের বন্ধু সরিন। ওই বলুক, কোর্টে কোনও কেস উঠলে, এই ধরনের কেস আগে কোথায় হয়েছে কি না তার ফলাফল কি, যদি জানা যায় তবে কি কেসকে দ্রুত সঠিক নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না ?

—নবারুণ, আমাদের মত আইনজীবীদের কাছে আগের সব কেসের রেফারেন্স-তো মূলধন। যে যত তা জোগাড় করতে পারবে, সেইতো তত নামী আইন-জীবী। আমাদের সিনিয়র এডভোকেটরা সেই সব রেফারেন্সের খবরটাই দেন। যে সিনিয়রের এইসব রেফারেন্স যত বেশী মনে থাকবে, তিনি ততই নামী এডভোকেট। সৌরীন খাসনবিশের সাফসুফ জবাব ভেসে আসে।

—দেখলিতো রোবোনা, ব্যাপারটা কি। এখন ধর, আমাদের এই বন্ধু সরিনের কাছে যে আইনী রোবোটে রাখলাম, তাকে পুরোনো সব কেসের রেফারেন্স ফিড্ করে ব্রেন-স্টোরেজের স্পেশাল স্টোর মেলে রেখে দিলাম। এখন সরিন দরকারমত আইনী-রোবোকে প্রশ্ন করলে রেফারেন্সের খবর কি মুহূর্তে পাবে না ?

—তা পাবে। রোবোনা আমতা আমতা করে বলে।

—তখন কি সরিনের পশার দ্রুত জমে উঠবে না ?

—আরে বাস ! এ যে চমকপ্রদ প্রপোজ্যাল। নবারুণ, বানাও এরকম রোবোট। আমি হব ফাস্ট বায়ার। খুশীতে আহ্লাদিত হয়ে বলে সৌরিন খাসনবিশ।

—বুঝছিস রোবোনা, তাহলে এরকম ধরনের নানান্ রোবোট রোবো-হাউসে যদি থাকে, তাহলে রোবো-হাউস কি মানুষের কাছে দামী হয়ে উঠবে না ?

—হ্যাঁ উঠবে।

—আর এই সমস্ত রোবোটকে তৈরি করে চালাবার দায়িত্ব যদি আমি রাখি তাহলে মানুষী সমাজের কাছে আমি বোধ হয় রোবোট যন্ত্রই হয়ে থাকবো না, হয়ে যাব সর্ববিষয়ক পরামর্শদাতা। আর সেই ভাবনাই আমার মনে। দেখিস্, আমি করবও তা।

২

এরপরই রোবোট নবারুণ রোবো-হাউসের গবেষণাগারে বন্ধ করে ফেলল নিজেকে। কিন্তু এই গবেষণা শুরুর আগে একদিন রোবোনাকে ডেকে বলল, —রোবোনা, কিছুদিন আমাকে আর ডাকাডাকি করতে পারবি না। বরং গবেষণার জন্য যখন যেমন জিনিস নিয়ে আসতে বলব এনে দিবি। এটুকু খাটাখাটুনি তোকে আমার জন্য করতে হবে।

—এই বিরাট বাড়িতে একলা একলা তাহলে আমি কি করব ?

—বাঃ, একলা কেন, সৌরিন আসবে। হ্যাঁ, একটা কথা রাখ আমার ? সৌরিনকে বিয়ে করে ফেল। আমার অ্যানালিসিস যে খুব গভীর হয় সেটাতো জানিস। আমার থটোস্কোপে দেখেছি, সৌরিন মুখে-মনে এক কথাই বলে। ভাল ছেলে। ওকে বিয়ে করলে তোর ভাল হবে। খুশী চোখে রোবোনাকে কথাগুলো বলে মিটি মিটি হাসে নবারুণ।

—বলছ ? রোবোনাও হাসে কথাটা বলে।

—গুড্, তাহলে তুই রাজী। আজই সৌরিনের সংগে এনগেজমেণ্ট ফাইন্যাল করে দিই। তাহলে তোর জন্য আর চিন্তা থাকবে না। নিশ্চিন্তে গবেষণাগারে মন বসাতে পারব। অবিবাহিত বোনের চিন্তা মাথায় থাকলে কাজ করা যায় ? সেদিন বিকেলে সৌরিন আসতেই নবারুণ চেপে ধরল—কি হে বন্ধু, আমার বোন রোবোনাকে বিয়ে করছ কবে ?

—বিয়ে ! ও কি রাজী হয়েছে ? চমকে ওঠে সরিন. কে. নবিশ।

—আহা, বলই না, কবে করছ বিয়ে ?

—নবারুণ, থ্যাংক ইউ। যদি বল, আজই রেজিস্টারের কাছে বিয়ের নোটিশ দিয়ে আসি। তারপর রেজিস্টার যবে ডেট দেবেন তখনই বিয়ে হবে। রোবোনা তুমি চুপ করে আছ যে খুশীর মাঝেও কেমন সন্দেহ সৌরিন খাশনবিশের কথায়।

—গার্জেন যখন নবারুণদা, আর মতই যখন দিয়েছে, গার্জেনকে অখুশী করি কি করে। ভালমানুষী গলায় বলে রোবোনা।

—নবারুণ ! আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। আনন্দে, আবেগে নবারুণের কৃত্রিম হাতটা চেপে ধরে সৌরিন খাশনবিশ।

তারপর খুব দ্রুতই বিয়ে হয়ে যায় রোবোনা আর সৌরিন খাসনবিশের। বিয়ের পরে রোবোনা চলে যায় সৌরিনদের বাড়িতে। তবে রোবোনাদের সংগে নবারুণের অলিখিত চুক্তি থাকে, প্রতিদিন সন্ধেয় রোবোনা-সৌরিন এসে নবারুণের খবর নিয়ে যাবে। রিসার্চের জিনিসপত্রের দরকার হলে তা এনে দেবে। ব্যস্, আর কিছু নয়।

রোবোনা চলে যায় বিয়ের পর। নবারুণও শুরু করে তার গভীর গবেষণা। রোবোট নবারুণকে সম্পূর্ণ মানুষ হতেই হবে। মানুষের কাছাকাছি হয়ে থাকলে আর চলছে না। মানুষের মত সব কিছুই চাই-ই নবারুণের। রোবোটদের রক্ষা করতে হোলে এটা একান্তই দরকার।

নবারুণ হিসেব করে দেখল তার সবকিছু তাকে একলাই করতে হচ্ছে। ফলে গবেষণা খুব দ্রুততালে চলছে না। রোবোটিক হিস্ট্রি থেকে দেখতে পেল ১৯৮০ নাগাদ কালিফোর্নিয়ার সেরা ইনজিনিয়ারিং কোম্পানি এক রোবোট পরিবার তৈরি করেছিল। স্টান, সাউল, সুসি আর সাম। এই চারজনকে নিয়ে ছিল সেই পরিবার। মহাকাশ অভিযানের জন্য নানান্ পরীক্ষায় এই চার রোবোট সংগীকে লাগান হয়। পলি-ইউরেথন ফোম দিয়ে মোড়া ছিল এই চার রোবোটের শরীর, আর প্ল্যাস্টিক প্রলেপ দিয়ে চামড়ার মত প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল সেইসব শরীরে। এর জন্যই এই চারজনকে মানুষের মত মনে হোত। এদের গা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি হোত না। এর চেয়েও উন্নততর পরিবার তৈরি করতে হবে এই রোবো-হাউসের জন্য। রোবো হাউসে শুধু একজন নবারুণই থাকবে, তা হয় না, তা ভাল দেখায় না।
প্ল্যানিং করতে বসল নবারুণ। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রোবোট থাকবে। প্রত্যেকে এক একটি বিভাগের দায়িত্বে থাকবে। যেমন কারিগরী বিষয়ের কাজ করার জন্য থাকবে "রোবোট ইনজিনিয়র বিশ্বকর্মা" ডাক্তারি বিষয়ক সব কাজের জন্য থাকবে "রোবোট-ডাক্তার ধন্বন্তরী", বিজ্ঞান-বিষয়ক সবরকমের গবেষণা পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য "রোবোট-আর্যভট্ট", আইনী পরামর্শ-বিচার-বিশ্লেষণের জন্য "রোবোট কৌটিল্য", বাড়ির নানান কাজকর্ম, ঘরদোর পরিষ্কার এসবের জন্য "রোবোট কর্মী সর্বগুণ", অতিথি আপ্যায়নের জন্য আর এক রোবোট-কর্মী "আপ্যায়নিকা" এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করে রোবোট পরিবার তৈরি হবে। এই পরিবারের রোবোট-মাস্টার হবে সে, রোবোট নবারুণ জোয়ারদার।
রোবো-নবারুণের কাজ শুরু হোল। প্রথমেই বানাল রোবোট বিশ্বকর্মাকে। কারিগরী সাহায্যকারী না হলে দ্রুত এই রোবোট পরিবার তৈরি সম্ভব নয় জেনেই এই ব্যবস্থা করল নবারুণ।
রোবোট বিশ্বকর্মাকে তৈরি করে সিনথেটিক স্ক্রিনে তাকে মুড়িয়ে মানুষের চেহারায় নিয়ে এল নবারুণ। ফ্লুরোকার্বন লিকুইড দেহের ভেইন টিউবে ঢুকিয়ে রক্ত চলাচলতুল্য ব্যবস্থা চালু করল। আর্টারি সিস্টেমকে তৈরি করল ডেক্রন প্ল্যাস্টিক টিউবিং-এ। শিলিকন রাবার দিয়ে পায়ের ট্যান্ডন মাসল তৈরি হোল। রোবো-বিশ্বকর্মার ব্রেন সেণ্টারে বসানো হোল ডিজিট্যাল-কমপিউটার ডিজিট্যাল কমপিউটারকে ক্ষুদ্রকায় সিলিকন চিপের মধ্যে আবদ্ধ করা হোল।

প্ল্যাস্টিক কেসের মধ্যে এরকম একাধিক সিলিকন চিপস্‌কে ঢুকিয়ে, শেষে, সার্কিট বোর্ডের সংগে লাগানো হোল। একাধিক এরকম সার্কিট বোর্ড একত্রিত ভাবে কম্পিউটার হিসাবে কাজ করতে লাগল।

বিশ্বকর্মার মেমারী আর এক্সট্রা মেমারী মেলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হোল। বাড়তি জায়গাও রাখা হোল মেমারী সেলে যাতে প্রয়োজনে নতুন তথ্যাদি রোবো-বিশ্বকর্মার ব্রেনে সংযোজন করা যায়। রোবো-বিশ্বকর্মা সচল হোল।

রোবো-হাউসে আজ খুশীর ঝলক। বিকেলে রোবোনা-সৌরিন আসতেই দরজা খুলে দিল নবারুণ। বলল—আয় রোবোনা। আজ তোদের রোবো-হাউসের নতুন সংগীর সংগে আলাপ করিয়ে দিই। এসো ভাই বিশ্বকর্মা।

—বিশ্বাকর্মা ! বিশ্বকর্মা কে ? অবাক গলা রোবোনার।

—নমস্কার। আমিই বিশ্বকর্মা। মাস্টার নবারুণের পরের ভাই। নবারুণদাই আমাকে বানিয়েছে এই রোবো-হাউস ল্যাবোরেটরিতে। রোবোট বিশ্বকর্মা ধীরে ধীরে ধাতব গলায় বলে।

—ওঃ ! তুমিই বিশ্বকর্মা ! তার মানে সৃষ্টির কাজ তোমার হাতে ! তাহলে তুমি হচ্ছ আমাদের রোবো-পরিবারের ইনজিনিয়র ? উকিলি বুদ্ধিতে কথাগুলো আস্তে আস্তে ছুঁড়ে দেয় সৌরিন খাসনবিশ।

—হ্যাঁ স্যার, আমিই রোবো ইনজিনিয়র বিশ্বকর্মা।

—নবারুণদা, তুমি তাহলে সত্যিই বানাচ্ছ তোমার সেই রোবো পরিবার ? রোবোনার বিস্ময় তখনও কাটে না।

—হ্যাঁ বোন, বানাতেই হচ্ছে। মানুষ যেমন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, রোবোটদেরও যদি সেই সমাজ গড়ে তুলতে না পারি, তবে রোবোটদের প্রগতি হবে না। রোবো-বিশ্বকর্মা, আমরা কতদিন সময় নেব এই রোবো ফ্যামিলি বানাতে ? নবারুণ অনেকটা মাস্টারি গলায় প্রশ্ন করে রোবো-বিশ্বকর্মাকে।

—নরারুণদা, আমাদের বর্তমান প্রজেক্ট হচ্ছে এখন, প্রথমে রোবো ধনবন্তরীকে বানানো, তারপর রোবো আর্যভট্ট, তারপর রোবো-কৌটিল্য। শেষে বানাতে হবে রোবো-বহুগুণা ও রোবো-আপ্যায়মিকাকে, তাই তো ? কাজের প্রোগ্রামটা একবার ঝালিয়ে নেয় রোবো-বিশ্বকর্মা।

—ধনবন্তরী, আর্যভট্ট, কৌটিল্য, এদের কি কি কাজ বুঝতে পারছি। কিন্তু রোবো বহুগুণা আর রোবো-আপ্যায়নিকার কাজ কি ভাই নবারুণ ? এই প্রথম অবাক হয় সৌরিন খাশনবিশ।

—কেন, ভাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কেন ? রোবো-বহুগুণা বাড়ির সর্ববিধ কাজ করবে, সেজন্যই তো বহুরকম গুণ সেট করা থাকবে ওর ব্রেনসেণ্টারে।

আর রোবো আপ্যায়নিকা অতিথিবর্গকে আদর-আপ্যায়ণ দেখাশুনা করবে। রিসার্চরুমে থাকলে চাইলেই তো চট করে চলে আসা যাবে না। সেজন্যই অতিথিদের জন্য এ ব্যবস্থা জরুরী।

—নাঃ, ব্যবস্থা মন্দ নয়। ভালই করেছ এসব ভেবে। যাই হোক, পরিবারের সব মেম্বার তৈরি হলে রোবো-হাউস জম-জমাট হবে, কি বল ? খুশী গলায় বলে সৌরিন।

—নবারুণদা, সত্যি বলছি, যত তোমায় দেখছি, তত অবাক্ হচ্ছি! তুমি সত্যিই এই রোবো পরিবার সৃষ্টি করবে !

—কেন বোন, এতে তোর আপত্তি আছে ?

—না নবারুণদা, আপত্তি নেই। তবে তোমার প্রতিভা দেখে অবাক হচ্ছি। বাবা মারা যাবার আগে একথাই বলেছিল, দেখবি রোবোনা, একদিন নবারুণ শুধু যে এক রোবোট পরিবার তৈরি করবে তা নয়, তৈরি করবে রোবোটদের নিজস্ব শহর। সেদিন বাবার কথাগুলোকে ভেবেছিলাম বৃদ্ধ মানুষের সুখী কল্পনা। কিন্তু আজ দেখছি তা নয়, সত্যিই কল্পনাকে ক্রমেই বাস্তবে নিয়ে আসছ তুমি।

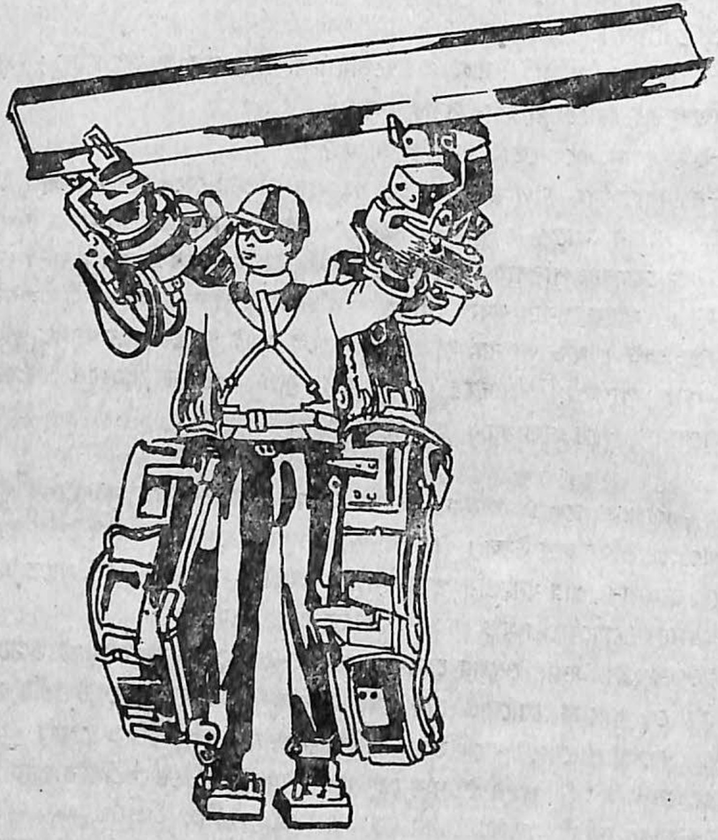
—ধ্যুৎ পাগলী। আদুরে ধাতব কণ্ঠ ফুটে ওঠে নবারুণের। সস্নেহে রোবোনার পিঠে হাত রাখে রোবো নবারুণ।

সময় এগিয়ে চলে। কয়েক বছরের মধ্যেই রোবো-হাউস নবারুণের সৃষ্ট রোবোটে ভর্তি হয়ে উঠল। রোবো-ইনজিনিয়ার রোবট বিশ্বকর্মা তৈরি করার পর, রোবো-ডাক্তার ধনন্তরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সংযোজন করল, যাতে তারা বায়োনারী রোবোটের মত কাজকর্ম করতে পারে তারা।

রোবো-হাউস এখন দেশের রোবোট সাপ্লাই-এর মুখ্য কারখানা হয়ে উঠেছে। যারা যে ধরনের রোবোট চায় সেই ধরনের ব্যবস্থাযুক্ত রোবোট তৈরি হয়। হসপিটালের রোবোটে থাকে ডাক্তারি বিষয়ক জ্ঞানযুক্ত পসিট্রনিক ব্রেন। কল-কারখানায় ভারী ওজন ইত্যাদি তোলার জন্য থাকে এক্সোস্কেলিটন রোবোট। আর আরও ভারী মালপত্র, যেমন বড় বড় কাঠের গুঁড়ি, ইত্যাদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করল ওয়াকিং-লরী রোবোট। এক্সোস্কেলিটনকে নাম দিল নবারুণ হার্ডিম্যান, আর ওয়াকিংলরী রোবোটের নাম হল সুপাররোবোম্যন। দারুণ চাহিদা হোল এই দুধরনের রোবোটের, নানান্ কলকারখানায়।

সৌরিন খাসনবিশের অ্যাসিস্টেণ্ট হিসাবে যে রোবোট তৈরি করে দিল নবারুণ, তার ব্রেন স্টোরেজে আইনের রিপোর্টস, রুলস্, এমন ভরাটি করে দিল নবারুণ যে শহরের পয়লা নম্বর আইনজীবী হয়ে উঠল সৌরিন অল্পদিনেই। সৌরিনের আজ আর দম্ ফেলার অবসর নেই।

রোবোনা যথারীতি আসে বিকেলে। একদিন রোবোনা বলল—নবারুণদা, অনেকদূরতো এগুলে রোবোটদের নিয়ে। রোবো-হাউসকে তুমি ভরিয়ে তুলেছ কাজে-কর্মে, রোবো-পরিবারের নতুন নতুন কর্মী দিয়ে। এবার বিশ্রাম নাও নবারুণদা। সেই কবে ২০১০ সালে, আজ থেকে ৬৫ বছর আগে, এই বাড়িতে,



হার্ডিম্যান এক্সোস্কেলিটন

রোবোট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি থেকে কিনে এনেছিলেন বাবা। ধীরে ধীরে তুমি রূপান্তরিত হোলে, স্বাধীন হয়ে হলে নবারুণদা। বিজ্ঞান জগতকে কতকিছু উপহার দিলে। এবার সত্যিই বিশ্রাম নাও, বিশ্রামের সময় হয়েছে তোমার নবারুণদা। যন্ত্রই বল, আর মানুষই বল, সবারই তো বিশ্রাম দরকার।

—না রোবোনা, কাজ শেষ হলো কই। টাকা দরকার অনেক, তাই রোবোট বানাচ্ছি, বিক্রী করছি। আসল কাজ তো শুরুই হয় নি।

—কি বলছ ! আসল কাজ শুরুই হয় নি ! বিস্ময় রোবোনার গলায় ।
—হ্যাঁ রোবোনা । বড় ভুল মন মানুষদের, তাই জরুরী কথাও মানুষরা ভুলে যায় । কেসে জেতার পরে, আজ পাঁচ বছরে অনেক ধরনের রোবোট বানালাম, অনেক কিছুই করলাম, কিন্তু আমি কি পুরুষ-নারীর জৈবিক প্রভেদ রোবোটিক শরীরে বসাতে পেরেছি ? হার্টের স্পন্দন, পাল্স বিড ইত্যাদি সংযোজিত করেছি আমার শরীরে ? না, সে সব কাজ যে আজও বাকী । এসবের জন্য টাকার দরকার ছিল, দরকার ছিল প্রয়োজনীয় রোবো ডাক্তার-ইনজিনিয়ার, রোবো-সায়েণ্টিস্টের । আজ সে-সব ব্যবস্থা হয়েছে । সামনের মাসেই তোর দাদা নবারুণের বিরাট অপারেশন হতে যাচ্ছে ।
—আবার অপারেশন ! ভয় পেয়ে যায় রোবোনা ।
—এবারের অপারেশনে রোবো-নবারুণ তার সমস্ত ত্রুটি কাটিয়ে সমকক্ষ হবে মানুষের । আনন্দিত ধাতব স্বর নবারুণের ।
কিন্তু এবার অপারেশন কে করবে ? এর আগে যতবার অপারেশন হয়েছে তোমার, বাবা থাকতে, কোন ভয় থাকত না । কিন্তু এবার সব দিকে খেয়াল রাখবে বে ? দুশ্চিন্তা ছেয়ে যায় রোবোনার কথায় ।
—এবার অপারেশন করছে রোবো-ধনন্তরী, এই রোবো-হাউসের চীফ রোবোট-ডাক্তার । দেখবি, মানুষের চেয়ে দ্রুততায় নিখুঁতভাবে প্রয়োজনীয় অপারেশন করবে । বিপদের ভয় থাকবে নারে রোবোনা ।
—কি জানি, কেন যে বারবার নিজেকে নিয়ে এই পরীক্ষা চালাচ্ছ ? বেশতো চলছে সব । ভীরু ভংগী রোবোনার ।
বিজ্ঞানীদের কি পরীক্ষার শেষ আছে ? ভীরু যারা, বিজ্ঞানী হওয়া তাদের সাজে না । ধৈর্য ধর, দেখনা কি হয় ।
চিন্তিত মন নিয়ে রোবোনা ফিরে যায় সৌরিনের কাছে ।

২০৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর এক উত্তেজনাময় দিন রোবো-হাউসের। রোবোট নবারুণ সম্পূর্ণভাবে বাইওনিক ম্যানে রূপান্তরিত হবে । অপারেশন করবে রোবো-ধন্বন্তরী । সহযোগী সার্জেন, রোবো-হাউসের নতুন অ্যাসিস্টেণ্ট রোবো সার্জেনরা । অপারেশন স্টাডি করবে টেলিভিশনে রোবো ইনস্টিটিউটের মানুষী বিজ্ঞানীরা, রোবোটি কি বায়লজিস্ট, রোবোটি কি সার্জেন, ইনটিটিউটের ডাইরেক্টর পৃথিবীর অন্য সব বিজ্ঞানীরা । সবাই উন্মুক, সবাই দেখতে চায় স্বাধীন রোবোট নবারুণ জোয়ারদার কেমন করে, কি ভাবে অপারেশন করে রূপান্তরিত হবে বাইওনিক ম্যানে, মানুষের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই । শুধু নবারুণের সৃস্ট রোবোটরা এই যুগান্তকারী কাজ করবে কিন্তু কেমন করে ? অপারেশন রুমের একদিকের দেওয়াল কাঁচে ঢাকা । ভিতরের অপারেশন পাশের

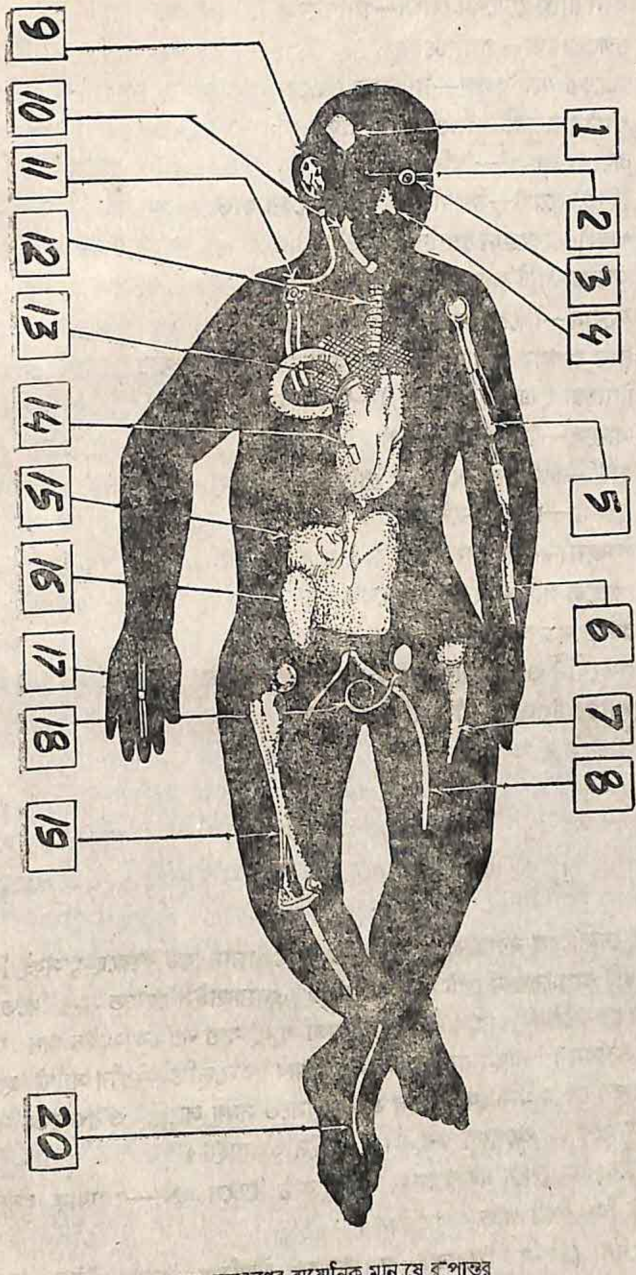
ঘর থেকে যাতে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখতে পারেন সেজন্যই নবারুণ এই ব্যবস্থা রেখেছে। ঘরের চারকোণে টেলিভিশন ক্যামেরা বসানো। ক্যামেরা রিমোট অটো কণ্ট্রোলে অপারেট হবে। যে মুহূর্তে অপারেশনের সুইচ অন হবে, তক্ষুনি টিভি ক্যামেরা চালু হয়ে যাবে। নবারুণের অনুরোধে, সৌরিন রোবোনার একান্ত প্রচেষ্টায়, ভারতীয় দূরদর্শন কেন্দ্র এই স্পেশাল রোবোটিক অপারেশন ভারতবর্ষের সমস্ত দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। বলতে গেলে ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। রোবোট কি শুধু রোবোটদের সাহায্যে সত্যিই তবে পুরোপুরি মানুষ হয়ে যাবে ?

রাত আটটায় শুরু হোল অপারেশন। টেবিলে রোবোট নবারুণ শুয়ে। মাথায় স্কাল প্লেট বসানো হোল, প্রাণীজ স্কাল দিয়ে মাথার খুলিকে ঢাকা হোল। কর্ণিয়া ও চোখের জায়গায় বসানো হোল প্ল্যাস্টিক কর্ণিয়াযুক্ত চোখ। চোখের মণিতে বসানো হোল কালো প্ল্যাস্টিক চোখের মণি। নাকের ও কানের কার্টিলেজে বসল সিলিকন রবারের নাক ও কান। মুখে, চোয়ালের দু কোণে বসল সেরোনিয়ম ধাতুর জ-বোন। কাঁধের সোলডার জয়েণ্ট ভিটেলিয়ম ধাতুর ইলেকট্রনিক ল্যারেনিকস্ ফিট করা হোল। বসলে ধাতব এলবো জয়েণ্ট, সেরোনিয়ম ধাতুর সিরামিক জাতীয় হাড় দিয়ে বানানো হোল হিপ জয়েণ্ট। ডেক্সন প্ল্যাস্টিক টিউবে তৈরি হোল আর্টারী ইলেকট্রনিকস্ ব্লাড প্রেসার রেগুলেটর, সিলিকন রবারের এয়ার প্যাসেজ ট্রাচিয়া। লানস্ তৈরি হোল সিলিকন রবারের, নিউক্লিয়র শক্তিযুক্ত সিলিকন রবারের স্পেশমেকার হার্ট সুংযুক্ত হোল। আর্টিফিসিয়ল লিভার ও কিড্নী ট্রানসপ্ল্যানটেড্ হয়ে নবারুণের দেহে সংযোজিত হোল। ইলেকট্রনিকস্ ব্লাডার স্টিমুলেটর, ধাতব ফিংগার জয়েণ্টস্, ধাতব থাইবোন ও হাঁটুর জয়েণ্টস্ বসল। যুক্ত হোল সিলিকন রবারের পায়ের ট্যানডন। এইভাবে ধীরে ধীরে রোবো নবারুণ বায়োনিক মানুষে রূপান্তরিত হোল। রূপান্তরিত হোল খাঁটি রোবোটিক মানুষে।

চারঘণ্টায় অপারেশন শেষ হোল। অপারেশন সুইচ অফ হোল। সবাই নিস্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল অপারেশন টেবিলের দিকে। নিথর নিশ্চুপ নবারুণ।

অবসারভেশন চেম্বার থেকে রোবোটিক বায়লজিস্ট ডঃ শংকরণ মাইক্রোফোনে জিজ্ঞেস করলেন,—ডঃ ধনন্তরী নবারুণ নিশ্চুপ কেন ? হি মাস্ট ওয়েক্ আপ ? অপারেশনে কি তবে ফল্ট হোল ?

—বিপ, বিপ, বিপ—গ্রীন আলো জ্বলে উঠলো অবসারভেশন রুমের দরজার মাথায়। রোবো ধনন্তরীর স্থির ধাতব কণ্ঠ ভেসে এল—ডোণ্ট ওরি ফ্রেণ্ডস।



রোবো নবারুণের বায়োনিক মানুষে রূপান্তর

১। স্কাল—জান্তব খুলিতে তৈরি
২। কর্নিয়া ও চোখের লেন্স—প্লাস্টিকের
৩। চক্ষুতারকা—প্ল্যাস্টিকের
৪। নাকের কার্টিলেজ—সিলিকন রবারের
৫। কাঠের জয়েণ্ট—ভিটেলিয়ম ধাতুর
৬। একবো জয়েণ্ট—বিশিষ্ট ধাতুর
৭। হিপ্ জয়েণ্ট—সিরোসিয়ম সিরামিকের হাড়
৮। ধমনী—ডেক্রোন প্ল্যাস্টিক টিউবিং-এর
৯। কানের কার্টিলেজ—সিলিকন রবারের
১০। জবোন—সিরোসিয়ম ধাতব পদার্থের
১১। ব্লাড প্রেসার রেগুলেটর—ইলেকট্রনিকের বিশিষ্ট যন্ত্র
১২। ট্র্যাচিয়া (এয়ার প্যাসেজ)—সিলিকন রবারের
১৩। লান্‌স্—সিলিকন রবারের
১৪। হার্ট—নিউক্লিয়র শক্তিযুক্ত সিলিকন রবারের
১৫। লিভার—ট্রান্সপ্লানটেড্
১৬। কিড্‌নী—ট্রান্সপ্লানটেড্
১৭। আঙ্গুল সন্ধি—ধাতব পদার্থের
১৮। রক্ত উত্তেজক—ইলেকট্রনিকস্-এর
১৯। থাইবোন ও তিড্‌নী জয়েণ্ট—ধাতব পদার্থের
২০। পায়ের ট্যানডন—সিলিকন রবারের

মাস্টার জেনারেল নবারুণ, যে ডায়াগ্রাম, যে প্রোগ্রাম ফিট করেছেন, সবই নিখুঁত-ভাবে এই অপারেশনে সেট করা হয়েছে। এনারজাইস হোতে সময় দিতে হবে। মাস্টার জেনারেল নবারুণ এখন আর তো শুধু যন্ত্র নয় যে সুইচ অন করলেই জেগে উঠবেন। এখন ব্যথা-বেদনা, এইসব অনুভূতি শরীর সৃষ্টি হয়েছে। অপারেশন শেষে মানুষের যেমন জ্ঞান আসতে সময় লাগে, ও'রও তেমনি কিছু সময় লাগবে। অপেক্ষা করুন। হি ইস অলরাইট।
ঘণ্টাখানেকের শেষে নবারুণের ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল—ধন্যবাদ ধন্যন্তরী। ধন্যবাদ বিশ্বকর্মা গুড অপারেশন।
নবারুণের চেতনা ফিরতেই দর্শকবৃন্দ উল্লসিত হয়ে উঠল আনন্দে।

নবারুণ, তুমি বিজ্ঞান জগতের গৌরব। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায়। জনতার উল্লাস ভেসে এল।
ধীরে ধীরে অপারেশন টেবিল থেকে উঠে বসল নবারুণ। দাঁড়াল তারপর। সামনের ফুল মিরারে নিজেকে দেখল। বন্ধুগণ, এখন আমি তো আপনাদের মত মানুষের মতই হয়েছি, নয় কি ?
—হ্যাঁ, হ্যাঁ। উচ্চকিত হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ।
—শুধু তাই নয় বন্ধু নবারুণ, মানুষের জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি-বিবেচনা যেখানে সীমিত, তুমি সেখানেও অসীম অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী। সৌরিন খাশনবিশের গলা ভেসে আসে।
—বন্ধুগণ, আজ থেকে আমি কি তবে মানুষ সমাজের সমস্ত সুখ-দুঃখের, গৌরব আনন্দের, দায়-দায়িত্বের সম অধিকারী হোতে পারি না, ঠিক আপনাদের মতই ? বায়োনিক মানুষ নবারুণ প্রশ্ন তুলে ধরে সমস্ত জনসমষ্টির সামনে।
—কেন নয় ? মানুষ যা পারে, বায়োনিক নবারুণ যদি বাইওলজিক্যাল ও ইলেকট্রনিক বস্তুর সংযোজনে সেই ক্ষমতার অধিকারী হয়। কেন তবে মানুষের সার্বিক অধিকার পাবে না। উচ্চকিত হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দের কণ্ঠ অবসারভেশন রুমে। জনতার উচ্চকিত কণ্ঠ বিদ্যুত তরঙ্গে ভেসে আসে অপারেশন রুমে, বায়োনিক মানুষ নবারুণের কানে।
—ধন্যবাদ। জনতার রায় আমি স্বীকার করে নিলাম। বিনম্র, বিনীত কণ্ঠ নবারুণের।
—নবারুণ, তুমি যতদিন, যতক্ষণ জনগণের উপকারী বন্ধু হয়ে থাকবে জনতা ততদিন এই রূপান্তরিত বায়োনিক মানুষ নবারুণকে ভালবাসবে। কিন্তু বন্ধু, যেদিন মানুষকেও ছাপিয়ে বড় হোতে চাইবে, লোভী মানুষের স্বার্থপরতা-ক্রূরতার ছোপ তোমার মধ্যে দেখা দেবে, সেদিন তোমার পতন নিশ্চিত, এ কথাটা কিন্তু মনে রেখ। রোবোনার স্বামী সৌরিন খাসনবিশ আনন্দঘন মুহূর্তেও সাবধান বাণীতে সজাগ করে দেয় নবারুণকে।
—মনে থাকার কথাটা সৌরিন। মানুষের বন্ধু হোতে গিয়ে শত্রু যেন না হই, তাই তো। সৎ-পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ সৌরিন। নবারুণের কথা শেষেয় সংগে সংগে টি ভি সেণ্টার প্রোগ্রাম শেষ করে।
২০৭৫ খ্রীস্টাব্দের শীতেল রাতের ১লা ডিসেম্বর এই ভাবেই রোবোট জগতের এক নবযুগের সূচনা করল।

নবারুণের রোবোনগরী

বাওনারী রোবোট নবারুণ আজকাল যেন ভীষণ গম্ভীর ধীর স্থির হয়ে উঠেছে। রোবো-হাউসের রোবোট পরিবারের সংখ্যা এখন ১২৬ জন। ছবির মত সব কিছুকে ভাগ করে দিয়েছে বাওনারী-রোবোট নবারুণ। প্রত্যেকটি কাজ ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করে নবারুণ। আজকাল সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যই বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি করে, প্রতি বিভাগের জন্য একজন হেড-রোবোটকে রেখেছে।

এইভাবে তৈরি হয়েছে ইনজিনিয়ারিং বিভাগ, যার মাথা হচ্ছে রোবো-বিশ্বকর্মা, বিশ্বকর্মার অধীনে আছে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ধাতববিদ্যা, স্থাপত্য ও মিশ্রিত কারিগরী কাজের জন্য মূল ছয়জন রোবোট-ইনজিনিয়র। এদের নাম হয়েছে সহকারী বিশ্বকর্মা—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬। এদের প্রতিজনকে সাহায্য করছে চারজন রোবোট সহকারী ইনজিনিয়র। এরা পরিচিত ক্ষুদে বিশ্বকর্মা ১, ২, ৩, ৪ বলে। এইভাবেই ইনজিনিয়ারিং বিভাগে, রোবোট-বিশ্বকর্মার অধীনে ৩০ জন রোবো-ইনজিনিয়ার কাজ করছে।

রোবোট-ধনবন্তরীর অধীনে ছটি মেডিক্যাল বিভাগ তৈরি হয়েছে। যেমন রোবো মেডিসিন, রোবো সার্জারি, রোবো ই. অ্যান্ড. টি, নিউরো-ইলেকট্রনোলজি, অ্যান্ডড্রয়েডো-পেডিক্স, জেনারেল রোবো ফিজিসিয়ন। এই ছয় মেডিক্যাল বিভাগ দেখছে ছয়জন সহকারী ধনবন্তরী। এদের ডাকা হয় সহ-ধনবন্তরী ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ বলে। এই ছয়জন সহ-ধনবন্তরীকে রোবো-চিকিৎসা কাজে সাহায্য করছে ক্ষুদে ধনবন্তরীরা। প্রতি সহ-ধনবন্তরীর সংগে আছে আবার ছজন করে এই ক্ষুদে ধনবন্তরী। মোট ৪২ জন সহকারী ও ক্ষুদে ধনবন্তরী মিলে এই ভাবেই রোবো-ধনবন্তরীর অধীনে রোবো চিকিৎসা ইউনিটকে চালু রেখেছে।

রোবোট-আর্যভট্টের অধীনে বিজ্ঞান বিভাগ কাজ করছে সাতজন সহকারী বিজ্ঞানী-রোবোটকে নিয়ে। এক একজন বিজ্ঞানী রোবোট এক একটি বিজ্ঞান শাখার দায়িত্বে রইল। প্রাণিবিদ্যা দেখতে লাগল রোবো-প্রাণী বিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিদ্যার তদারকিতে থাকল রোবো উদ্ভিদবিজ্ঞানী, রোবো-ভূবিজ্ঞানী দেখতে লাগল ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক সবকিছু। রসায়নের জন্য রইল রোবো-রাসায়নিক আর পদার্থবিদ্যার জন্য রোবো-পদার্থবিজ্ঞানী। অংকবিষয়ক জটিল সবকিছু সমাধান করতে লাগল রোবো-গণিতক। অন্যান্য সবকিছু বিজ্ঞানের

কাজ দেখতে লাগল রোবো সর্ববিজ্ঞানী। এই সাত বিজ্ঞানীর প্রতিজনের অধীনে
রয়েছে পাঁচজন করে সহকারী ক্ষুদে বিজ্ঞানী রোবোট। এরা পরিচিত ক্ষুদে
বিজ্ঞানী ১, ২, ৩, ৪, ৫ বলে। রোবোট বিজ্ঞান শাখা এইভাবেই রোবো-
আর্যভট্টের অধীনে কাজ করছে মোট ৪২ জন রোবোট-বিজ্ঞানী নিয়ে।
রোবোট কৌটিল্যর অধীনে আইনী বিভাগ তৈরি হয়েছে। সহকারী ২০ জন
রোবোট-আইনবিদ রয়েছে। একজন দেখছে রোবো-সিভিল সেক্সন, আর অন্যজন
রোবো ক্রিমিন্যাল সেক্সন। এদের নাম হয়েছে সহকারী রোবো কৌটিল্য। আবার
সবকিছু নথিভুক্ত করার জন্য, প্রোগ্রাম করার জন্য, প্রতি সহকারী রোবো
আইনবিদের অধীনে আছে দুজন করে ক্ষুদে রোবো আইনবিদ্। নবারুণ
এদের নাম দিয়েছে ক্ষুদে কৌটিল্য ১, ২ বলে। আইনী বিভাগে এভাবেই কাজ
করেছে ছয় জন রোবোট।

তবে রোবো-হাউসের বাড়িঘরের সবকিছু তদারকী করছে সেই একজনই রোবোট
রোবো-সর্বগুণা। এর কর্মক্ষমতা সাধারণ রোবোটের দশগুণ করে দেওয়ায়
সবকাজ একলাই সামলাতে পারে এই রোবো-সর্বগুণা।

কিন্তু ঝামেলা বেধেছে রিসেপসনিস্ট রোবোটকে নিয়ে। রোবো-আপ্যায়নিকা
কাজকর্ম সব ভাল করলেও নবারুণের বারবারই মনে হচ্ছে কি জানি কোথায়
যেন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। শেষে ত্রুটিটা আবিষ্কারও করেছে, আজ দিন কয়েক
হোল। বুঝতে পেরেছে, রোবো-আপ্যায়নিকা তাদের মত সব রোবোট থেকে
আলাদা হবে, ঠিক নারীরা পুরুষদের থেকে যেমন আলাদা হয়, ঠিক তেমনি।
কিন্তু কেমন করে সেটা হবে, সেই চিন্তাই নবারুণকে ভাবিয়ে তুলেছে।
দফায় দফায় মিটিং চলছে নবারুণের রোবো-ধনন্তরী আর রোবো-বিশ্বকর্মাকে
নিয়ে। কি অপারেশন করলে রোবো-আপ্যায়নিকাকে সঠিক নারী রোবোটে
রূপান্তরিত করা যায়, তার জন্য কি মেটালো-ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা দরকার, এসবই
সেই সব পরামর্শের মাধ্যমে স্থির হচ্ছে।

শেষে ঠিক হোল, প্রথম অপারেশন নবারুণের ওপরই হবে। তাতে নবারুণ
মানুষ রোবোট থেকে পুরুষ রোবোটে রূপান্তরিত হবে। শুধু তাই নয়,
হিসাব মতে নবারুণকে মানুষ যদি হোতেই হয়, তবে অ্যাটমিক সেল
থেকে শক্তি সংগ্রহ না করে পুরোপুরি হাইড্রোকার্বন থেকে শক্তি সংগ্রহের
ব্যবস্থা রাখতে হবে অ্যানড্রয়েড বডির মধ্যে। কিন্তু গোল বেধেছে
সেখানেই।

রোবো ধনন্তরী বলে—দেখুন মাস্টার, হাইড্রোকার্বনিক সিস্টেম রাখা যেতে
পারে। কিন্তু তাহলে যে শক্ত খাদ্য খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই শক্ত
খাদ্য থেকেই হাইড্রোকার্বন সৃষ্টি হয়ে আপনার সিস্টেমকে শক্তি জোগাবে।
কিন্তু মুস্কিল কি জানেন? এই ক্ষেত্রে অজারিত খাদ্যকণা, ত্যক্ত তরলকে

বাইরে বের করার পথও রাখতে হবে। না হলে আপনার সিস্টেম চোক্‌ড হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

—জানি ধন্বন্তরী। এতদিন অলিভ-অয়েল খেয়ে এসেছি। সমস্ত সিস্টেমকে এই অলিভ-অয়েল চালু রেখেছে। কিন্তু সলিড-জাতীয় খাদ্য খেলে, ত্যক্ত শক্ত বা তরল পদার্থ বার করার জন্য ঠিক মানুষের মন্ত্র জননযন্ত্র ও পায়ুদেশ রাখতে হবে বৈকি। আর এই ব্যবস্থা রাখার ফলেই পুরুষ রোবোট ও নারী রোবোটের চেহারাগত তফাত সৃষ্টি হবে। অবশ্য চুল, বক্ষদেশ, এসবেও প্রভেদটা পুরুষ ও নারী রোবোটের রাখতে হবে। কিন্তু এইসব পুরুষোচিত সিস্টেম কি আমার মত বাইওনারী রোবোটে বসানো অসম্ভব? আমি তো এর ডায়াগ্রাম ওয়ার্কিং সিস্টেম তোমাদের এঁকে দিয়েছি। রোবো বিশ্বকর্মা, তুমি কি এ বিষয়ে আমার প্রসথিটোলজির জেনিটাল ও অ্যানাস চেপ্টারটা বুঝে নাও নি রোবো-ধন্বন্তরির কাছ থেকে?

—পড়েছি স্যার। যেভাবে সেলফ্‌ কনট্রোলড ডিজাইনও বার করেছি। ইনটেসটাইনের মত লম্বা টিউবও বার করেছি, যা ইলেকট্রনিক সিস্টেমে একবার সংকুচিত ও পরে প্রসারিত হতে পারে। শক্ত ফুড গ্রেইনস তাই এর মধ্য দিয়ে যাবার সময় মথিত হয়ে এনার্জি সাপ্লাই করবে। ত্যক্ত শক্ত পদার্থ মলরূপে বেরিয়ে যাবে পিছনের রোবো পায়ুদেশ দিয়ে, আর ত্যক্ত তরলক নির্গত হবে সামনের রোবো জননেন্দ্রিয় দিয়ে খুব সহজেই। রোবো-ধন্বন্তরি এসব যাতে ঠিক করতে পারে আপনার দেহে, সে ব্যবস্থাও রেখেছি।

—ও কে। কালই এই অপারেশন হবে। এর পর পরই রোবো-আপ্যায়নিকাকে নারী গঠনশৈলী দিয়ে নারী রোবোটে রূপান্তরিত করবে। রোবোট পরিবারে নারী নেই, তাতো হয় না, হোতে পারে না। আর দেখছ না, আপ্যায়নিকা, নামটাই নারীজনোচিত। ওকে মেয়ে-রোবোট করতেই হবে।

—স্যার, অপারেশনের আগে ম্যাডাম রোবোনার সংগে পরামর্শ করবেন না? রোবো-সর্বগুণা পাশ থেকে বলে ওঠে।

—সিওর। আজই রোবোনা-সৌরিনের মতটা নিয়ে নেব। প্রথমে আপত্তি করলেও, শেষে রাজী হবে দেখো।

সেই সন্ধ্যায় রোবোনা-সৌরিন রোবো-হাউসে এলে নবারুণ ওদের মতটা চাইতেই রোবোনা হৈ-চৈ করে উঠল।

—আচ্ছা নবারুণদা, এত ঘন ঘন এরকম অপারেশন করে বিপদ ডাকছ কেন? আর কি চাই তোমার? মানুষী মর্যাদা পেয়েছ, মানুষী অধিকার পেয়েছ, আর বাকী থাকছে কি?

—নাঃ, নাঃ নবারুণ, ইটস টু ফার। এক্সপেরিমেণ্টের একটা সীমা থাকবে তো!

বুঝছ না কেন, তুমি বারবার এক্সপেরিমেণ্ট করছ আর তার জন্য কি দুশ্চিন্তা ভাবনা ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের? বাওনারী নবারুণ এই স্ট্রেইন সহ্য করতে পারে, কিন্তু আমরা মানুষরা তা পারি না।

—আহা! ভয় পাস কেন তোরা? যাই করি না কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—দেখ নবারুণদা, এই বয়সে এই দুশ্চিন্তা সহ্য হয় না। তোমার কোন কাজেই বাধা দেয় নি। কিন্তু আজ আর মত দিচ্ছি না। রোবোনার গলায় চিন্তা, ভাবনা।

—লক্ষ্মী বোন, মত দে। বয়সের কথা বলছিস? কত বয়স তোর? জন্মেছিস তো ২০৪০ সালে। আর আজ ২০৮০ সাল, তোর বয়স হোল চল্লিশ বছর। এ আর এমন কি? আর ভাব, আমার বয়স কত? ২০১০ সালে স্যার জোয়ারদার আমায় আনেন এই বাড়িতে, আর আজ ২০৮০তে বয়স হোল আমার ৭০ বছর, তোর প্রায় দু-গুণ।

—যাই বল বন্ধু বয়স বেশি বলেই যথেচ্ছাচার করবে? আমরা আইনজীবী আমাদের মতে প্রয়োজনের বেশি কিছু করা মানেই যথেচ্ছাচার। তুমিই বল, মানুষের মত পুরুষেন্দ্রিয়, পায়ুদেশ দিয়ে তোমার মত রোবো-মানুষের কি লাভ? সৌরিন খাসনবিশ জেরা করে নবারুণকে।

—বাঃ, কি বললাম আগে তোমাদের! এই দুই নির্গমন পথ দরকার শক্ত খাদ্য যা খাব, তার ত্যক্ত পদার্থকে বাইরে ফেলার জন্য। নবারুণ বোঝাবার চেষ্টা করে রোবোনা-সৌরিনকে।

—তার জন্য সামনে-পিছনে দুটো নির্গমন ছিদ্র রাখলেই হোত? নাঃ নবারুণ, আর্গুমেণ্টস্‌এ ঠিক পাচ্ছ না। তুমি চাইছ, যা করবে, তা মানুষের শারীরিক গঠনশৈলীর মতই যাতে দেখতে হয়, তাই না?

—যদি কিছু করিই, সেটা মানুষের মত করাই কি ভালো নয়? এটাতো ঠিক মানুষী শারীরিক যন্ত্রপাতির কর্মক্ষমতা খুব ভাল না হলেও মানুষী যন্ত্রপাতির চেহারা দেখার দিকে শোভন। আমি তাই শোভন চেহারার যন্ত্রকে, অধিকতর কর্মক্ষম করে, নিজ শরীরে যুক্ত করে দেখতে চাই তার ফলাফল কি। এতে ভবিষ্যতে, মানুষের শরীরেও এজাতীয় কৃত্রিম যন্ত্র স্থাপন করে মানুষের কর্মশক্তি, জীবনীশক্তি বাড়ানো যাবে। বল, মানুষী শরীরে এরকম কৃত্রিম যন্ত্র আজ কি বসানো হচ্ছে না?

—না হচ্ছে না বলছি না। তবে, আম্‌তা আম্‌তা করে বলে সৌরিন।

—কি ব্যাপার সৌরিন, নবারুণদার কথা শুনে তোমার মত তার্কিক আইনজীবীও যে চুপ করে গেলে! ব্যাপারটা কি বলত? কিছু রহস্য আছে মনে হচ্ছে। নবারুণদা, তুমিই বল। বাইও-নবারুণ মিথ্যে বলতে পারে না, জানি তো।

একঝলক সৌরিনের দিকে তাকায় নবারুণ। অসহায়তা সৌরিনের চোখে।
নবারুণ হাসে মিষ্টি করে ক্লিক্-ক্লিক, তারপর বলে—সত্য গোপন না করাই ভাল, বুঝেছ বন্ধু। শোন রোবোনা, সৌরিনের বয়েস হোল তো প্রায় পঞ্চাশের মত। কয়েকমাস আগে আমার কাছে এল, বলল, ভাই বড় ঝামেলায় পড়েছি। বয়সের জন্য মেমারী আজকাল বড় ফেইল করছে। রোবো অ্যাসিটেন্ট সব রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছে, তবুও কোর্টে উঠে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। ফলে লাস্ট কয়েকমাসে কোন কেসই জিততে পারি নি।
—হ্যাঁ, তাতো জানি। মাঝে কয়েকমাস সব কটা কেসে ও হারে। বাড়িতে মনমরা হয়ে বসে থাকত। রোবোনা কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠে।
—ঠিক এই সময়েই সৌরিন আসে আমার কাছে। বলে, খুব তো রোবোটদের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছ। পার আমার ব্রেনটাকে আবার সতেজ করে দিতে? পার এমন ব্যবস্থা করতে, যাতে প্রতিপক্ষকে প্রতি কেসে গো হারা হারাতে পারি? নবারুণ আস্তে আস্তে কথাগুলো বলতে থাকে।
—তারপর। বিস্ময় রোবোনার চোখে।
—তারপর আর কি? ছোট্ট ঘণ্টাখানেকের অপারেশন করলাম সৌরিনের ব্রেনে। এক্সট্রা মেমারি বক্স আর প্রসেসর বসালাম। ব্রেনে এরপর যে কথা ঢুকছে, আজীবন গাঁথা থাকছে সৌরিনের। তারপর সব কেস ঝাঁ-ঝাঁ করে জিতে ফেলছে সৌরিন খাসনবিশ। বলেই ক্লা-ক্লা-ক্লা করে হেসে ওঠে বাওনারী নবারুণ।
—বন্ধু, সবই বলেছ যখন, তখন শেষটুকু আর চেপে লাভ কি? সৌরিনই বলে কথাটা।
—তার মানে! আরও আছে! আবার চমকায় রোবোনা।
—আর বোল না তোমার নবারুণদার কাণ্ড। এক্সট্রা ব্রেনবক্স বসালো সবকিছু হয়ে যাবার পর। বলল, নাঃ, তোমাদের মত মানুষদের বিশ্বাস নেই। এত কাণ্ডের পরও কেসগুলো না জিতলে বলবে, নবারুণটা বোগাস্। তাই একটা থটোস্কোপ দিয়ে দিল আমায়। ফলে যখন সওয়াল করি, অন্য পক্ষের উকিলের, অন্য পক্ষের সাক্ষীদের মনের কথা থটোস্কোপে লেখা হয়ে যায়। ফলে অন্য পক্ষের অজান্তে ওদের সব গুপ্তকথা জেনে, ওদেরই কুপোকাত করে ফেলি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্রেফ তোমার দাদার দেওয়া রোবোট-আইনবিদের শেখানো কথা কোর্টে আওড়াই, আর বাহোবা নিই।
—নাঃ দাদা, তোমাকে আর বলার কিছু নেই। তুমি সব পার। কে জানে, দেখব একদিন আমাকেও বাওম্যান বানিয়ে দিয়েছে। অসহায়তা রোবোনার গলায়।
—যাঃ, তোকে রোবোট বানাব কি? তোকে বরং রোবোটের মত দীর্ঘজীবী করে দেব। যাক্, মত দিচ্ছিস তো অপারেশনের?

—আর দিচ্ছি ! না দিলে শুনবে ? কর অপারেশন, তবে ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কষ্ট দিও না। দুশ্চিন্তা রোবোনার গলায়।
—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাবিস না। সবকিছুই সাবধানে করব। তবে মত দেবার জন্য ধন্যবাদ।

রোবো-হাউসের রোবো-মাস্টার নবারুণ এখন শুধু বাওনারী-ম্যান নয় এখন পুরোপুরি বাওনারী হি-ম্যান, বাওনারী-পুরুষ। আর এই রোবো-হাউসের রিসেপসনিস্ট রোবো-আপ্যায়নিকা হচ্ছে রোবো ইতিহাসের প্রথম নারী-রোবোট। নবারুণ ওর নাম রেখেছে রোবো-নবরূপা। রোবো-আপ্যায়নিকা নামটা বড় বিদ্‌ঘুটে, তাই ছোট করে নবারুণের সংগে মিলিয়ে নাম হয়েছে নবরূপা। রোবো-নবরূপার মেয়েদের মত চোখ-মুখ, দীর্ঘ কেস, ক্ষীণ তটি, উঁচু বক্ষযুগল, ভারী নিতম্ব। মেয়েদের চলার মত শ্লথ চলার ভংগী। মোটামুটি না বললে বোঝা যায় না, নবরূপা রোবোট। গলার স্বরও নরম, মেয়েলী ধরনের।
নবারুণের নতুন এইসব কার্যকলাপের খবর সবই পেঁছাতে লাগল পূর্ব-এশিয়ার সায়েন্স-টেকনলজী সেণ্টারে। শেষে, ঐ সেণ্টারের রোবো-বাইওলজি, প্রসিথোটলজী বিভাগের, অনারারী মেম্বার নির্বাচিত হোল বাইনারী-হিম্যান নবারুণ।
কাগজে নবারুণের ছবিসহ খবরটা বেরুতেই হৈ-চৈ করে ছুটে এল রোবোনা-সৌরিন। কন্‌গ্র্যাচুলেশন বন্ধু। দুর্মুখ বিজ্ঞানীরাও তবে আজ তোমার প্রতিভাকে স্বীকার করল।
—দেখ সৌরিন, এইসব মেম্বার-টেম্বার হয়ে কি লাভ বলত ? এখন পর্যন্ত যা করেছি, তা রোবোট জগতকে সমৃদ্ধ করার জন্য। কিন্তু তোমরা আমাদের প্রথম যখন সৃষ্টি কর, তখন মানুষী-জগতের উন্নতিকল্পেই আমাদের এনেছিলে, তাই নয় কি ?
—হ্যাঁ, বটেই। রোবোটও বহুকাজ আমাদের করেছে। স্পেশ ট্রাভেলে রোবোটরাই তো প্রথম যাচ্ছে। কলকারখানায় রোবোটরা বেশ কাজে লেগে গেছে। বেশ কিছু অফিসেও রোবোটরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত।
—সৌরিন, সবই হচ্ছে. তবুও মানুষরা রোবোটদের সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত নয়। তুমি কি একটা কলকারখানা দেখাতে পার, একটা অফিস দেখাতে পার, একটা স্পেশ-মুভমেণ্ট দেখাতে পার, যেখানে সম্পূর্ণ ভাবে শুধু রোবোটরাই যুক্ত ?
—নাঃ, তা কি করে হবে নবারুণ ? কিছু মানুষ তো দরকারই।
—কেন সৌরিন ? তোমাদের ডেটাফিড করবে রোবোট। জটিল ক্যালকুলেশন, চার্ট, প্রোগ্রাম, সব করে দেবে রোবোট। সমস্ত বিপজ্জনক চলাফেরার পথিকৃৎ

হবে রোবোট। তারপর মানুষ সবকিছু জেনে শুনে, চলবে-ফিরবে, আর বাহবা নেবে? এটা কি ঠিক? মানুষ কেন ঠিক করবে না কতটা কাজ? কি কি কাজ মানুষরা করবে আর কি করবে রোবোটরা? নবারুণের গলায় বেশ তীব্রতা।

—তুমি কি মানুষের ওপর বিদ্রোহী হোতে চাইছ নবারুণ?

—না সৌরিন, বিদ্রোহী নয়, বিরক্ত হচ্ছি। যা মানুষেরা পারবে না, তা ছেড়ে দাও আমাদের। আমি আমার রোবো-বন্ধুদের নিয়ে তার সমাধান করে মানুষদের সাহায্য করব। রোবোট মানেই যে ভৃত্যতুল্য এই কথাটা তোমাদের ভুলতে হবে। কিন্তু সেটাই তোমরা পারছ না।

—কি করবে নবারুণ। রোবোট কথাটায় যে যারা ভৃত্যতুল্য কাজ করে, তাদেরই বোঝায়। তাই যদি হয়, মানুষ সেভাবে ভাবলে ভুল কোথায়?

—ভুল নয়? যারা তোমাদের অক্ষমতাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সক্ষম করে তুলছে, তারা ভৃত্য না হোয়ে বন্ধু কেন হোতে পারে না? বাওনারী পুরুষ রোবোট নবারুণের গলায় তীক্ষ্ন-তীব্রতা।

—এসব নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামাতে বসলে কেন দাদা? এতদিন বেশ তো খুশীতে ছিলে, আবার এই উল্টোপাল্টা ভাবনা কেন? বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর এই প্রথম কথা বলল রোবোনা।

—মানুষদের সচেতন করার সময় এসেছে রোবোনা। রোবোটরা, আজ একশ বছর পরে, আর যন্ত্রসমষ্টিযুক্ত শুধু রোবোট নয় এটা বুঝতেই হবে মানুষদের সে চেষ্টাই করছি।

—সে আবার কি চেষ্টা? সৌরিন-রোবোনা দুজনেই অবাক্ হয়ে যায় কথা শুনে।

—রোবোনা, আজ আমাদের রোবো-হাউসে রোবোট-বন্ধুদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ। এদের থাকার জন্য আলাদা "রোবো-কটেজ" বানাতে হয়েছে রোবো-হাউসের গায়েই, দেখেছিস বোধহয়। এবার আমি দশহাজার একর জমি কিনেছি, এখান থেকে বারশো কিলোমিটার দূরে জলা-এঁদো জায়গায়। আমি দেখাতে চাই, যে জায়গা, যে ভূমি, মানুষ পরিত্যক্ত করছে, সেখানেই আমি রোবো-বন্ধুদের নিয়ে কি করতে পারি। বন্ধ্যা জমি কেমন করে জনহিতকর জমি হয়ে ওঠে।

—তার মানে তুমি মানুষদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছ নবারুণ? ভ্রূকুটি করে সৌরিন।

—চ্যালেঞ্জ বোলছ কেন? পরীক্ষা যদি আমার সফল হয়, আর সেই বন্ধ্যা জমি যদি শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে তবে তার সুফল কে পাবে, আমরা, না তোমরা? বল সৌরিন?

—সুফল অবশ্য মানুষই ভোগ করবে।

—তাই যদি হয়, তবে সহজ ভাবে নেবে না কেন এই পরীক্ষাকে? জান কি

কারণ ? মানুষ তার অক্ষমতাকে জেনে গেছে। আর তারই সংগে জেনেছে, এই রোবোটদের হাতেই যন্ত্রযুগের প্রগতির চাবিকাঠি এসেছে বহুলাংশেই।



মুন-রোবো রিসার্চ সেণ্টার

মানুষ তাই ভয় পাচ্ছে আমাদের। আর সেখানেই আমার ক্ষোভ। যাকে বন্ধু করলে মানুষ সুফল পেত আরও দ্রুততায়, কেন তাকে শত্রু ভাবছে ? কেন শত্রু করছে রোবোটদের ?

—ভুল ধারণা। তোমাদের, রোবোটদের কেউ শত্রু ভাবছে না। এবার প্রতিবাদ করে সরোষে সৌরিন।

—করছে না ? তবে শোন সৌরিন, স্পেশ রিসার্চ থেকে আমাকে অফার করা হয়, যাতে কাজে ছয়জন রোবোট ও ছয়জন মানুষী বিজ্ঞানী নিয়ে গিয়ে "মুন-রোবোট-রিসার্চ সেণ্টার" স্থাপন করে আসি।

—তাই নাকি নবারুণ ! সে সেণ্টার বসিয়ে এসেছ চাঁদে ? খুশী খুশী গলা সৌরিনের।

—পারলাম কোথায় সৌরিন ? মানুষী বৈজ্ঞানিকরা বাওনারী রোবোট এই

নবারুণের অধীনে কাজ করতে রাজী হয় নি। ফলেই সে প্রোগ্রাম ক্যানসেল হয়ে গেছে।

—ইস্, একটা ভাল কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আপশোষ করে রোবোনা এবার।

—নাঃ, বন্ধ হয় নি। আমিই যাব মাসখানেকের মধ্যে আমার ছয়জন রোবো-টীম নিয়ে। মানুষের এই অহমিকাতেই মানুষ ঠকে গেল। মুন-রোবো-সেণ্টার স্থাপন হবেই, কিন্তু তার গৌরব থেকে নিজেদের বঞ্চিত করল মানুষেরাই। বল সৌরিন, এসব দেখে-শুনে, মানুষী অহমিকা, মানুষী অজ্ঞতার ওপর আমার ক্ষোভ কি অন্যায়?

নিশ্চুপ থেকে রোবোনা-সৌরিন। তারপর বাড়িতে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ায় দুজনে। সৌরিন বলে—নবারুণ রোবো উইশেন্। তুমি এগিয়ে যাও, আমরা আজীবন তোমারই সাথে আছি, থাকব।

—থ্যাংক ইউ। অজস্র ধন্যবাদ সৌরিন। এনড্রয়েডিক হাতে নবারুণ দুহাত জড়িয়ে ধরে সৌরিনের। স্নিগ্ধ হাসি রোবোনার চোখে-মুখে।

বিশ বছর পার হয়ে গেছে কোথা দিয়ে। এদিন ২১০০ খৃীস্টাব্দের ১লা জানুআরি। কাগজে কাগজে বাওনারী রোবো-হি-ম্যান নবারুণের ছবি আর খবরে প্রথম পাতা ভর্তি। নবারুণ জাতি ও দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতিতে এনেছে নবজাগরণ। আবাসস্থলের ব্যবস্থা করেছে সুলভতম মূল্যে খাদ্য ভাণ্ডারের প্রাচুর্যে দেশকে শষ্য-শ্যামলা-সুফলা করে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

রোবো-হাউসের ড্রইংরুম বিশিষ্ট নর-নারীতে ভর্তি। এসেছে সবদেশের রিপোর্টার।

ঘরের সেণ্টার চেয়ারে বসে নবারুণ। নবারুণের পাশে বসে পঞ্চাশ বছরের বর্ষীয়সী নারী রোবোনা। রোবোনার পাশে বসে ষাট বছরের বর্ষীয়ান সৌরিন খাসনবিশ।

সমস্ত অতিথিদের আপ্যায়ন করছে রোবো হাউসের আপ্যায়নিকা, রোবো নবরূপা। পানীয় ও খাদ্য দিয়ে সবাইকে তৃপ্ত করছে রোবো-হাউসের সর্বকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, রোবো-সর্বগুণা।

ইণ্টারন্যাশনাল পেপারের প্রতিনিধি প্রশ্ন করল—মিস্টার বাওম্যান নবারুণ, আপনি কি বলবেন, কেমন করে আপনি এঁদো পরিত্যক্ত দশ হাজার একর জমিতে আপনার "রোবো-নগরী" গড়ে তুললেন? তাকে সুজলা-সুফলা-শষ্যশ্যামলা করলেন?

ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজী নবারুণের এই বিশেষ ইনটারভিউর ব্যবস্থা হয়েছে। তারা ওয়ার্লড টি. ভি, ও টি. ভি গ্রুপকে এই ইণ্টারভিউ

কভারেজের জন্য পারমিশন দেওয়ায় ও. টি. ভি ইণ্টারভিউ কভার করে, শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সমস্ত দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে তা প্রচারও করছে। পৃথিবীর আপামর জনতা উদগ্র-আগ্রহে এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখছে আর পুলকিত হয়ে উঠছে।

ইণ্টারন্যাশনাল পেপারের প্রতিনিধির প্রশ্ন শুনে বাওনারী পুরুষ রোবোট নবারুণ আস্তে আস্তে গাম্ভীর্যময় গলায় বলল—মানুষী বন্ধুগণ, আপনারা আজ রোবো-হাউসে এসে একে মর্যাদাময় করেছেন বলে, আমি, আমার সহকারী রোবো-সাথীগণ আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের পদার্পণে আমার গুরু আমার স্রণ্টা আমার পিতা, ডঃ সত্যশংকর জোয়ারদারের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন যে সত্য হোতে চলেছে, তাই প্রমাণ করছে। ডঃ সত্যশংকরই একমাত্র জ্ঞানী পুরুষ যিনি প্রথম বুঝেছিলেন, রোবোটকে মানুষদের অধীনস্থ ক্রীড়নক যন্ত্র বলে আজীবন ভৃত্যসম করে রাখা অন্যায় ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই উনিই প্রথম মানুষ, যিনি আমার মত রোবোটকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সুযোগ্যকন্যা রোবোনা-জোয়ারদার ও পরবর্তীকালে রোবোনার বন্ধু ও স্বামী সৌরিন খাশনবিশ, এই রোবোট নবারুণকে মানুষের সমকক্ষ আইনি অধিকার অর্জনের সুযোগ দিয়ে, রোবোটিক সমীক্ষার-পরীক্ষা বিস্তৃত পথ খুলে দিয়েছিলেন। রোবোটিক জনসমষ্টি তাই রোবোনা-সৌরিনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

হাততালিতে রোবো-হাউসের সুবিশাল ভিজিটিং ও অবজারভেশন রুম ভরে ওঠে।

নবারুণ বলতে থাকে—বন্ধুগণ, এই প্রসংগে আমি ন্যায়াধিশ জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তীর সৎ-প্রাজ্ঞ ধীশক্তি ও বিচারের কথা বলব। আজকে আমি আমার সহকারী রোবো-বন্ধুদের নিয়ে যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পেরেছি, তা জাস্টিস্ সুবর্ণ চক্রবর্তীর ন্যায়বিচারের ফলেই। তিনি যদি ডঃ সত্যশংকরের উইলমতে আমাকে রোবো-হাউসের, ডঃ সত্যশংকরের যাবতীয় রিসার্চের অছিপদে অধিষ্ঠিত না রাখতেন, তবে রোবোট-ইতিহাসের এই প্রগতি হোত না। শুধু তাই নয়, রোবোটকে যাতে মানুষ আঘাত করতে না পারে, তার ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য আইনি ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেন। রোবোট সেদিন থেকেই মানুষের সমকক্ষ আইনি অধিকার পায়। ঐ দেখুন, অতি শুভ্র কেশ, শান্ত-ধীর, অশীতিপর যে মানুষ ঐখানে বসে আছেন, উনিই আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন জাস্টিস্, শ্রীসুবর্ণ চক্রবর্তী।

হাততালিতে আবার মুখর হয়ে ওঠে রোবো-হাউসের অবজারভেশন রুম। ও. টি. ভি. সুবর্ণ চৌধুরী শান্ত-ধীর মূর্তিকে তার ক্যামেরায় মুহূর্তে ধরে ফেলে।

—বন্ধুগণ আপনারাই বলুন। এইসব সৎ প্রাজ্ঞ মানুষ যতদিন বাঁচবেন ততদিন দেশের উন্নতি হবে, ন্যয় কি? দেশের আইন-বিচার ততই সমৃদ্ধ হবে, নয় কি?

—নিশ্চয়ই। এক বাক্যে অতিথিরা বলে ওঠেন।

—কিন্তু বন্ধুগণ, দেখুন শ্রদ্ধেয় সুবর্ণ চক্রবর্তীকে। স্পনডিলিসিস বাত, দৃষ্টিক্ষীণতা, হার্টের দুর্বলতা, সব কিছুই জড়িয়ে আছে জাস্টিস সুবর্ণর দেহে। মৃত্যু ওর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। বলুন, মানুষী বিজ্ঞান এই প্রাজ্ঞ সৎ মানুষকে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

জনতা নিশ্চুপ। নিশ্চুপ ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজী আই. এস. টি-র প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রবার্ট ফিনগল্যাণ্ড।

—আপনাদের নিশ্চুপতাই বলে দিচ্ছে জাস্টিস চক্রবর্তী যতই বৃদ্ধ হচ্ছেন শরীরের অংগ-প্রত্যংগ অকেজো হচ্ছে, আপনাদের অভিধানমতে উনি বাতিল হয়ে যাচ্ছেন। শেষে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়লে আপনারা শোকসভা করে আপনাদের শেষ কর্তব্য করবেন। কিন্তু এইখানে, এইরকম ক্ষেত্রে, যখন যাকে আপনারা বাতিল করে দিচ্ছেন, অকেজো বলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, রোবোট মানুষের প্রতিভূ হয়ে আমি তাদেরই তুলে নিয়ে কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু সেই কাজের যা সুফল সে সবই আপনাদের মানুষী জগতকে বিনামূল্যে উপহার দিচ্ছি। বলুন তবে বন্ধুগণ, রোবোটদের এই কাজ ভাল কি মন্দ? এসব কি তবে মানুষের উপকারী কাজ না, অপকারী কাজ?

—না, না, এ সব কাজ আমরা সানন্দে মহৎ কাজ বলে স্বীকার করছি। বলে ওঠেন আই. এস. টির প্রেসিডেণ্ট ফিনগ্‌ল্যাণ্ড।

—অথচ বন্ধুগণ, তবুও বাইওনারী নবারুণ আপনাদের কাছে রোবোটই। আমার সব সহকারীও শুধু রোবোটই আপনাদের চোখে। ভেবে দেখুন, রোবো ধনন্তরীর সমকক্ষ ডাক্তার, রোবো-বিশ্বকর্মার মত ইনজিনিয়ার, রোবো—আর্যভট্টের মত বিজ্ঞানী, রোবো-কৌটিল্যের মত আইনজ্ঞ আপনাদের একটাও আছে? না নেই। তবুও এরা মানুষী অভিযানে শুধু রোবোটই। অথচ এদের আপনারা সহজেই বলতে পারতেন বাইও ম্যান কিংবা মাশীনাদ্রুগ অর্থাৎ যন্ত্রবন্ধু। বলুন, উপকারীকে বন্ধু বলে স্বীকার করলে আপনাদেরই মহত্ত্ব কি বাড়ত না?

দর্শকরা নিশ্চুপ হয়ে মাথা নিচু করে। ইনটারন্যাশনাল টি. ভি. সেণ্টারের চেয়ারম্যান মিস্টার রডাড্রিকস্ বলেন—বন্ধুরা, বাইওম্যান নবারুণের কথা বিবেচনাযোগ্য। সত্যিই তো, বন্ধুকে বন্ধু বলতে আপত্তি কোথায়?

—রাশিয়ান শব্দযুক্ত মাশীনাদ্রুগ্, মানে যন্ত্রবন্ধু নামটা খুব ভাল শোনাচ্ছে না। বলেন আই. এস. টি-র প্রেসিডেণ্ট ডঃ ফিনগল্যাণ্ড।

—মানুষী বন্ধুগণ, আপনারা তবে আমাদের শুধু ভৃত্য, অর্থাৎ রোবোট না বলে, বন্ধু বলে মানতে রাজী হয়েছেন? বেশ, তবে প্রস্তাব দিচ্ছি, আমাদের সহকারী বন্ধুরা আজ থেকে পরিচিত হোক সুরোবো অর্থাৎ সুহৃদ-রোবো, বন্ধু রোবো বলে। সুরোবো আপনাদের রোবোটও হোল, সুহৃদ হয়েও থাকল।

আবার সরবে হাততালি পড়ল। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হোল, ২১০০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুআরির পর রোবোটদের শুধু রেবোট বলা অপরাধ হবে। নতুন নামকরণ হোল রোবোটদের "সুরোবো"। আর বাওনারী রোবোট নবারুণের নামকরণ হোল মিস্টার বাওরুণ জোয়ারদার, প্রেসিডেণ্ট, ইউনিভার্সাল রোবোটিক ইনস্টিটিউট।

ইণ্টারন্যাশনাল পেপারের প্রতিনিধি আবার উঠে দাঁড়ালেন, প্রশ্ন করলেন—মিষ্টার বাওরুণ জোয়ারদার, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি কেমন করে আপনার অপূর্ব রোবো-নগরী গড়ে উঠল?

—ইয়েস মিস্টার জেং হোয়া, এবার সেই কথাতেই আসছি। আমরা রোবো সমাজ, পরিত্যক্ত পদার্থ, অপ্রয়োজনীয় জায়গা জমিকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। এই চিন্তাধারায় বহু খোঁজাখুঁজির পর দশহাজার একর পরিত্যক্ত জলা জমি খুঁজে বার করি। তারপর সেখানে সুপারফার্ম স্থাপন করি। তাকিয়ে দেখুন, সামনেই সেই সুপারফার্মযুক্ত রোবো টাইনসিপের মডেল।

—এখানকার সমস্ত কাজকারবার যদি বুঝিয়ে বলেন মিস্টার বাওরুণ। অনুরোধ করে ইণ্টারন্যাশন্যাল টি. ভি-র প্রেসিডেণ্ট মিস্টার বওড্রিকস।

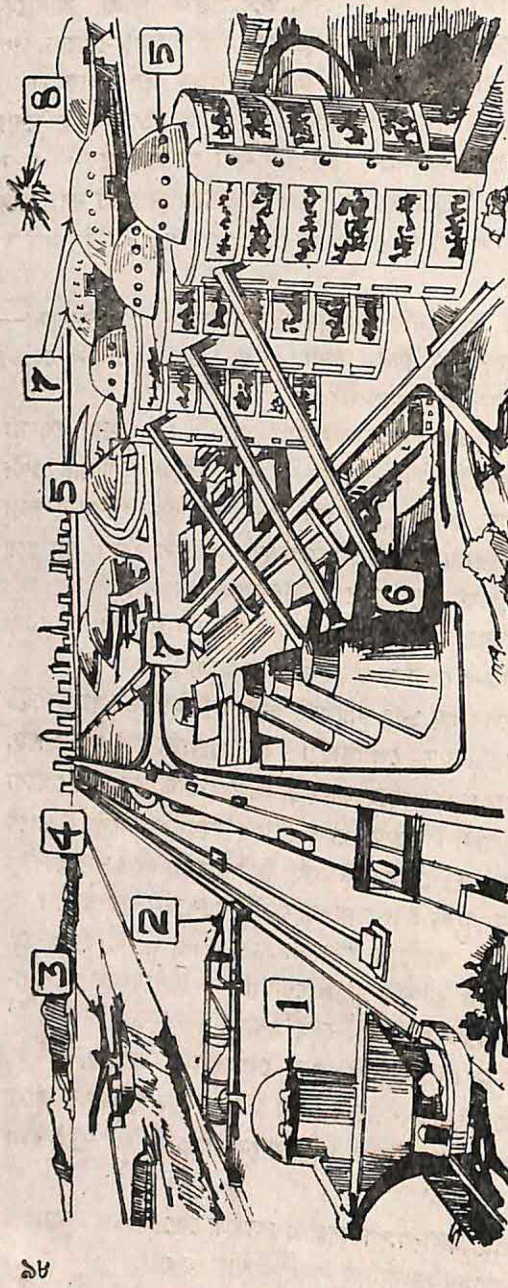
—ইয়েস, বোঝাচ্ছি। মডেলের এই ১নং জায়গাটি হচ্ছে ফার্মহাউস। স্যাটেলাইট মাধ্যমে আবহাওয়ার খবর এখানে পেঁছায়। আর খাদ্যভাণ্ডার কত আছে, কত শস্য উৎপন্ন হোল, সেসব খবর রখেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টোর রেকর্ডার রোবো এরপর দেখুন ২নং জায়গাটা। মোনোরেল ট্র্যাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কি ভাবে ফসল ফলানো হচ্ছে দেখুন। হেলিজেট স্প্রে দিয়ে কেমন করে সার দেওয়া হচ্ছে, কীটনাশক ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৩নং জায়গায় সেটাই দেখছেন আপনারা।

—বাঃ, বেশ মজাদার কায়দা করেছেন তো বাওরুণ মশাই। খুশীতে বলে ওঠেন এদেশের নামী সাংবাদিক শ্যামকিশোর ঘোষ। সবই দেখছি আপনা-আপনিই হচ্ছে। সময় অপচয় বলে কিছুই নেই এখানে।

—স্যার, সবটুকু দেখে নিন। কতটুকুই আর দেখলেন। এরপর, দেখুন, শস্যকণা যা কাটাই হোল তাকে সাক্সন-পাম্পে টেনে নিয়ে ফাপা পাইপের মধ্যে দিয়ে দূরে, বিভিন্ন শহরে, সোজাসুজি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাই ৪নং জায়গায় দেখান হয়েছে।

—স্পেলেনডিড্। এ দেখছি জল-পাম্প করে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর মত কতকটা। বলেন সাংবাদিক শ্যামকিশোর ঘোষ।

—ঠিকই। চিন্তাটা ঠিক এভাবেই এসেছিল। তারপর দেখুন, পোলট্রি সিস্টেম কিভাবে করেছি। ছ-তলা যুক্ত, গোলাকার আবাসস্থলে মুরগী, ভেড়া এসবের



রোবো টাউনশিপের মডেল

১। ফার্ম হাউস, ২। স্বয়ংক্রিয় ভাবে ক্ষেতি করার যন্ত্র, ৩। হেলিজেট স্প্রে দিয়ে কিভাবে সার দেওয়া হচ্ছে, ৪। শস্যকণা পাম্প করে দূর শহরে পাঠান হচ্ছে, ৫। বনস্তেবী ফার্মিং ও পশুপালন ব্যবস্থা, ৬। মনোরেল মাধ্যমে কিভাবে পশুমাংস অন্য শহরে চালান হচ্ছে, ৭। প্ল্যাস্টিক ডোমযুক্ত শস্যভাণ্ডার, ৮। মহাকাশে পরিক্রমণকারী আয়না, যার মাধ্যমে শহরে আলো আসছে।

পালনক্ষেত্র করেছি। আলো-হাওয়া আসার জন্য চারপাশে পারফোরেটেড প্ল্যাটোগ্লাস ওয়াল আছে। খাদ্য পাম্প করে চলে আসছে সোজাসুজি গোলাকৃতি মুরগী ভেড়াদের পালন ক্ষেত্রে। ৫নং পয়েণ্টে এসবই বিস্তারিত দেখছেন। সবজীও ঠিক এভাবেই ৫নং পয়েণ্টে ফার্মিং হচ্ছে। অল্প জায়গায় পাঁচস্তর ফার্মিং। কৃত্রিম মাটির স্তরে চলছে এই ফার্মিং।

—সুপার্ব! বিউটিফুল! বলে ওঠেন রডড্রিকস।

—তারপর শাকসব্জী আর মাংস চালানের জন্য পশুপালন ও সব্জী ক্ষেত্রের পাশ দিয়েই ছুটে চলেছে মেদোরেইল। সোজা চালান যাচ্ছে আশে-পাশের শহরে। ৬নং পয়েণ্ট মেনোরেলকেই ছুটতে দেখছেন। লোডিং হওয়া মাত্রই রেল চালু হয়ে যায়। সবই রিমোট কণ্ট্রোলে চালাচ্ছেন রোবোনা।

—মিস্টার বাওরুণ ৭নং পয়েণ্টে স্বচ্ছ কাঁচের ঢাকনা দেওয়া ওটা কি? বাশয়ান রিপোটার কারপভের বিস্মিত প্রশ্ন।

—টমেটো জাতীয় সহজ পচনীয় সবজী রাখার ভাণ্ডার হচ্ছে ওগুলো। সূর্যের আলোও আসছে, পোকামাকড়ও খেতে পারছে না সব্জীকে। এক-একটায় ১টন মত সবজী থাকতে পারে।

—আর আট নম্বর পয়েণ্টে চিকমিক করছে ওটা কি? বিস্ময়ে প্রশ্ন করে জাপানী রিপোটার মানুজো ইদেহারা।

হেসে ফ্যলে বাওরুণ। স্যার, এটাই আমার রাতের স্পেশাল ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা। অরবিটিং স্পেশ মিরার বসিয়ে, অন্যগ্রহের আলো নিয়ে, এই শহরকে আলো জোগাচ্ছি। কোনও ইলেকট্রিক কারেণ্টের দরকার হচ্ছে না। বরং সূর্যের আলোর সালোক-সংশ্লেষের ফলে অন্য সমস্ত জায়গার যখন শুধু দিনের বেলায়ই ফসল বাড়ে, তখন আমার রোবো--শহরে, দিনে রাতে দুসময়েই সূর্য্যের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত, আলো থাকায় ২৪ ঘণ্টা ধরেই সালোক-সংশ্লেষ হয়ে, ফসল আপনা থেকেই দু-তিনগুণ বেশি হচ্ছে। দিনরাতে আলো থাকলেও আমার রোবো বন্ধুদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে না কারণ, ওরা থাকছে পাতাল ঘরে।

—ও-য়া-ণ্ডা-র-ফুল। সরবে হাততালি দিয়ে ওঠেন সমস্ত অতিথি অভ্যাগত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা।

—বন্ধুগণ, প্রোটিন জাতীয় প্রাণীজ খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রাণি হত্যা করে পরিবেশ ভারসাম্য আপনা নষ্ট করছেন। তাকিয়ে দেখুন, ১৯ শতাব্দীর পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে ছিল ১৫৫ কোটি, ২০ শতাব্দীতে তাই বেড়ে দাঁড়াল ৬০০ কোটিতে। শেষে সেই সংখ্যাই আজ ২১ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েছে ১৫০০ কোটিতে। এই বিপুল জনসংখ্যার প্রোটিন খাদ্যভাণ্ডার, প্রাণিহত্যা করে জোগাড় করা মানেই, পরিবেশের সমূহ বিপর্যয়।

—তাহলে প্রোটিন খাদ্য জোগাড় হবে কি করে? অবাক হয়ে যান দর্শকরা।

—সেজন্যই সোয়াবিন, মিটোবিন, জাতীয় প্রোটিন ফল সৃষ্টি করেছি। মাংসের স্বাদ আনার জন্য সামান্য মাত্রায় মাংসের কুচি মিশিয়ে, গ্রাইন্ড করে, মাংসের কিমজাতীয় পদার্থ প্রোটাভেজ বানানো হয়েছে। ১টন সোয়াবিন বা মিটোবিনের সংগে আধ কেজি মাংসকুচি মেশালেই এই নতুন ধরনের উদ্ভিজ মাংসকিমা তৈরি হয়। যেসব প্রাণী বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছে, তাদেরই সিলেকট করে, স্বল্প প্রয়োজনীয় মাংস জোগাড় করে মেশাচ্ছি। সোয়াবিন মিটোবিনের সংগে তৈরি হচ্ছে প্রোটিন খাদ্য "প্রোটোভেজ"।
—বাঃ বাঃ, মজাদার কাজ করেছেন তো বাওরুণ মশাই। জবাব নেই আপনারা জনৈক অতিথি উত্তেজিত গলায় বলেন।
—এরই সংগে সমুদ্রতলে ফিসফার্মিং-এর ব্যবস্থা রেখেছি। টাউনসিপের বাড়িঘর সবটাই আছে মাটির তলে। সেখানে টেম্পারেচর কণ্ট্রোলিং ডিভাইস আছে অর্বিটো-স্পেশ-মিরার অ্যাডজাস্ট করে, তাপমাত্রা সঠিক রেখে, তাকেই মাটির-তলের ব্যাড়গুলোর মধ্যে প্রবাহিত করা হচ্ছে। আর মাটির ওপরে চলে ফার্মিং ফলে অল্প জায়গায় বহু কাজই হয়। আমাদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা সমানেই চলছে। তবে যে কাজ ঈর্ষাকাতর মানুষের জন্য শুরু করা যায় নি, তা হচ্ছে চাঁদে যে রোবো রিসার্চ সেণ্টার হবে তার জন্য আমরা ছ-জন সুরোবো সংগীর সংগে ছজন মানুষী বিজ্ঞানীকে পাওয়া। চাঁদে মানুষী আর কি প্রয়োজনীয়তা চাই, মানুষই ভাল জানবেন, তাই মানুষী বিজ্ঞানীদের চেয়ে ছিলাম। এখন দেখছি তাদের পাওয়া যাবে না।
—সে কি! কেউ সংগী হোতে চায় নি। প্রেস রিপোটারেরা বিস্ময়ে চমকে উঠেন কিন্তু কেন?
—সেই অভিযানে রোবোট নবারুণের নেতৃত্বে মানুষ বিজ্ঞানী কাজ করতে চায় নি, তাই। ধীর কণ্ঠ বাওরুণ জোয়ারদারের গলায়। বলুন, আজ কি কোনও মানুষী বিজ্ঞানী সেই বৈজ্ঞানিক সভায় যেতে রাজী?
সবাই নিশ্চুপ। নিশ্চুপ ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স টেকনলজীর প্রেসিডেণ্ট।
—দেখেছেন বন্ধুগণ, মানুষ তার অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। প্রভুত্ব চালাবে রোবোটদের ওপর, কিন্তু রোবোটদের জ্ঞানশক্তির চেয়ে তারা যে শ্রেষ্ঠতর তার প্রমাণ আজ কিন্তু মানুষেরা রাখছেন না। তাই বন্ধুগণ, আজ বোধ হয় আপনাদের সাবধান করার সময় এসেছে, সজাগ হোন, আমাদের বন্ধু হন। তা নাহলে সেদিন দূরে নয়, যখন দেখবেন আমরা, আমাদের রোবোট বন্ধুদের নিয়ে পৃথক জগত গড়ে তুলেছি। আর তখন অন্যগ্রহের অধিবাসীদের ভয়ে আপনারা যতটা আতঙ্কিত, তার চেয়েও বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াব আমরাই।
—তার মানে, রোবোট সমাজের নেতা হয়ে বাত্তরুণ জোয়ারদার, আপনি

আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? রুখে ওঠেন ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স—টেকনলজীর প্রেসিডেণ্ট রবার্ট ফিনগল্যাণ্ড।

হাসে বাত্তরুণ। বলে—কিছু আগেই আমাদের আপনারা বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন। স্বীকার করেছেন, ভৃত্যতুল্য কাজ আর করছি না আমরা। তাই রোবোট কথাটা আজ আর রোবোট জগতের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাইই যদি হয়, তাহলে আপনারা যদি আমাদের নেতৃত্ব দেন, আর তা যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে উল্টোটাই বা হবে না কেন ডক্টর ফিনগল্যাণ্ড?

—তা হয় না মিস্টার বাত্তরুণ। ক্ষীপ্ত কঠিনস্বর ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স টেকনলজীর প্রেসিডেণ্ট মিস্টার রবার্ট ফিনগ্ল্যাণ্ডের।

—তার মানে, বন্ধু হব, কিন্তু কর্তৃত্বের চাবিকাঠি মানুষের হাতে থাকবে। না তা হয় না মিস্টার রোবোট। একটা কথার আমাকে জবাব দিন তো, আপনারা ইউনিভার্সাল রোবোটিক ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট বানালেন আমাকে, ভাল কথা। রোবোট বিষয়ক জ্ঞান যে আমার সমকক্ষ আর কারুর নেই তা সবাই জানে। তাই এই মনোনয়ন অন্যায় নয়। কিন্তু কৈ, ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজীর সভাপতির পদটাকেতো আমায় উপহার দিলেন না মিস্টার রোবোট? আমার বিজ্ঞান জ্ঞান আপনার চেয়ে কি কম? আপনার চেয়ে কি কম বিজ্ঞানপ্রসূত সুফল এই পৃথিবীর জনসমষ্টিকে আমি উপহার দিয়েছি? না, দেই নি। তাহলে আপনার চেয়ারে আমি কেন বসতে পারি না? সোজা কঠোর প্রশ্ন বাওরুণ জোয়ারদারের।

—না, মানুষ মানুষই। যতই স্বয়ংক্রিয় হোক্, মানুষের মত সঠিক চেহারার হোক্। জ্ঞানী হোক, রোবোট যন্ত্রসমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কর্কশ উচ্চকণ্ঠ আই. এস. টির প্রেসিডেণ্ট রবার্ট ফিনগ্ল্যাণ্ডের।

—বেশ পরীক্ষা হোক্। বন্ধুগণ, পৃথিবীর মানুষ বন্ধুরা, আপনারা যারা এই টি ভি দেখছেন, আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন মানুষী বিজ্ঞানী রবার্ট ফিনগল্যাণ্ডস, না এই রোবোট বিজ্ঞানী রোবোট বাত্তরুণ জোয়ারদারকে এই ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্স ও টেকনলজীর সভাপতি হবার যোগ্যতর বলে মনে করেন? আপনাদের মতামত পাঠাবেন ইউনাইটেড নেশনসের সভাপতির কাছে। নবারুণের ঘোষণা শেষ হয়।

—চমৎকার। সত্যিই রোমহর্ষক ব্যাপার। কে বড়, মানুষ না যন্ত্র, পরীক্ষার সময় তাহলে এসেই গেল। উত্তেজিত কণ্ঠ ভারতীয় রিপোর্টার শ্যামকিশোর ঘোষের।

—বন্ধুগণ, আজকের অনুষ্ঠানের শেষে আমি আপনাদের একটি ঘণ্টাখানেকের ছোট্ট অপারেশন দেখাব। অকেজো, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসা মানুষকে

কেমন করে আরও ১০০ বছর অক্লেশে কর্মক্ষম রাখা যায় এ তারই পরীক্ষা। জ্ঞানী মানুষ জাস্টিস্ সুবর্ণ চক্রবর্তী তাঁর অকেজো দেহে এই পরীক্ষা করার সুযোগ দিচ্ছেন বলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এইসব জ্ঞানী মানুষেরাই বিজ্ঞানকে প্রগতির পথে নিতে সাহায্য করেন। এঁরা আছেন বলেই বিজ্ঞান এগুচ্ছে, মানুষেরা বেঁচে আছেন।

নিস্তব্ধতা দর্শকমহলে। রোমাঞ্চকর ঘটনা দেখার জন্য উন্মুখ সবাই। বাওরুণ জোয়ারদার সুরোবো-ধন্বন্তরী, সুরোবো-বিশ্বকর্মা ও তার সহকর্মী রোবোটদের নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে আসে। সুবর্ণ চক্রবর্তীকে অপারেশন টেবিলে শোয়ান হয়।

অপারেশন রুম থেকে ভেসে আসে বাওরুণের কণ্ঠ—বন্ধুগণ, আমাদের শ্রদ্ধেয় সুবর্ণ চক্রবর্তীর হাত-পা প্রায় অকেজো। দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্সা। হার্ট প্রায় অক্ষম। দেখুন, কিভাবে, সহজ উপায়ে এই অক্ষমতাকে উনি কাটিয়ে উঠবেন।

শুরু হোল অপারেশন। হাত-পা-কেটে অ্যানড্রয়েডিক হাত-পা বসানো হোল। হার্ট রিমোভ করে নিউক্লিয়র শক্তিযুক্ত সিলিকন রবারের হার্ট সেট করা হোল। চোখের কর্নিয়া ও লেন্সে বসানো হোল টেলিস্কোপিক ফিটিংসযুক্ত প্ল্যাস্টিক আই। ব্রেন সেণ্টারে বাড়তি মেমরী বক্স ফিট করা হোল। কিড্‌নি বদলে দেওয়া হোল। অপারেশন শেষ হোল ৪০ মিনিটের মধ্যে। তারপর ২০ মিনিট পোস্ট অপারেশনের অবসারভেসন। শেষ হোল অপারেশন।

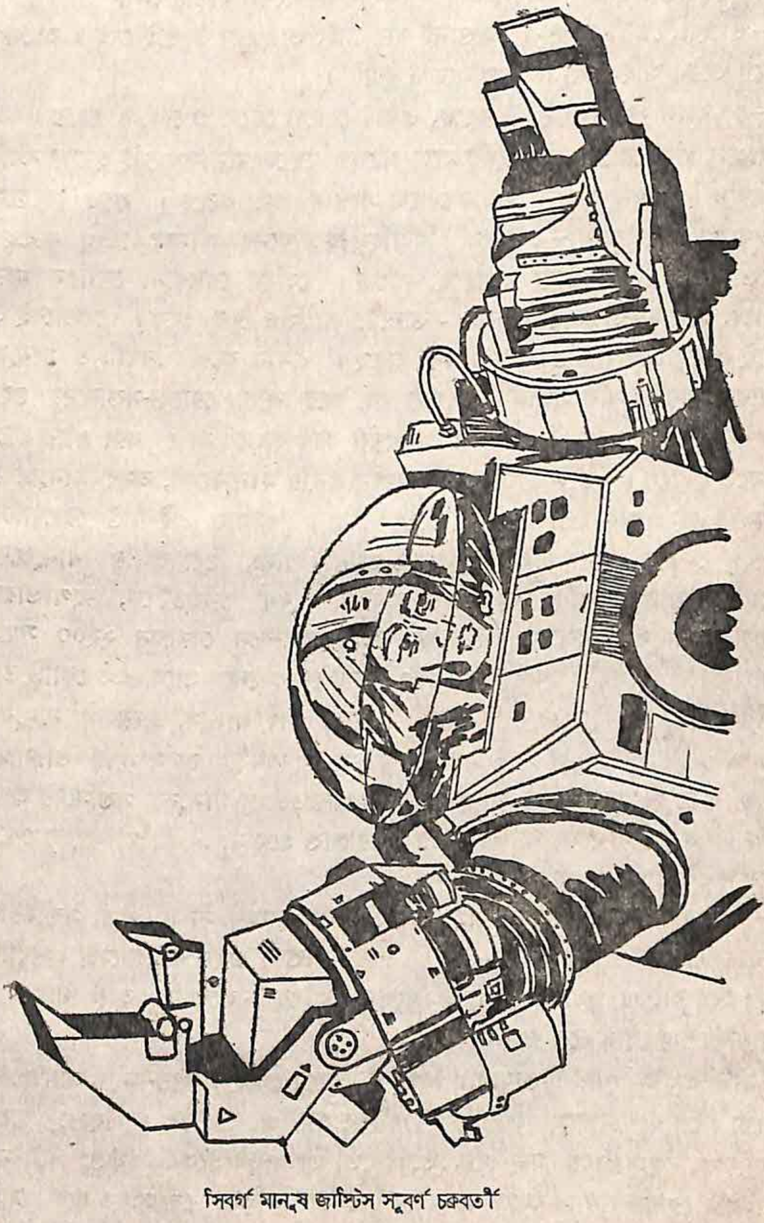
—বন্ধুগণ, অপারেশন শেষ। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুবর্ণ চক্রবর্তী আবার একশ বছরের পরমায়ু পেলেন। এর অর্দ্ধেক শরীরে যন্ত্রযুক্ত হোল, বাকী অর্দ্ধেক মানুষী জৈবিক শরীরই থাকল। বলুন এখন, একে কি বলবেন, মানুষ, না, রোবোট? নবারুণের কঠিন প্রশ্ন ভেসে এল অপারেশন রুম থেকে।

নিশ্চুপ দর্শকমণ্ডলী। বিহ্বল টিভির দর্শক-শ্রোতারা। তাইতো? সুবর্ণ চক্রবর্তী তাহলে কি এখন? হাত-পা-চোখ-হার্ট-কিডনি সবই যান্ত্রিক। এ যে আধা মানুষ, আধা রোবোট।

—ইয়েস স্যার, এই পৃথিবীর প্রয়োজনীয় মানুষ যাঁরা, তাঁদেরই শুধু বাঁচান এই ভাবেই দেশের স্বার্থে। এঁরা অর্দ্ধযন্ত্র অর্দ্ধমানুষ। এদের বলুন সিবর্গ মানুষ বা মানুষ অর্থাৎ যন্ত্র প্লাস মানুষ। সুবর্ণ চৌধুরী পথিকৃত এই নতুন দিগন্তের।

—বাওরুণ জোয়ারদার, আপনি কি উন্মাদ? পৃথিবীর জনসংখ্যা আজ ১৫০০ কোটি। এই অবস্থায়, একদিকে জনসংখ্যা বাড়বে, অন্যদিকে লোকরা মরবে না তাহলে কি হবে জনসংখ্যার চেহারা, ভেবেছেন? আই. এস. টির সভাপতি রবার্ট এবার ক্ষেপেই ওঠেন বাওরুণের ওপর।

—না, আপনারা চাইলে, জনসংখ্যা বাড়বে না। বাড়বে শুধু কর্মী রোবোট যাদের প্রয়োজন শেষে আপনারা নির্জীব করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। তাতে কারুর ক্ষতি হবে না।



সিবর্গ মানুষ জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তী

—কিন্তু জনসংখ্যা বাড়বে না, একথা বলছেন কেমন করে ? প্রশ্ন সাংবাদিকদের।
—তাকান আমার মানুষী বোন রোবোনা আর তার স্বামী সৌরিনের দিকে। ওরা বিবাহিত জীবনে সুখী। ওদের কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু ওদের মানুষী সন্তান নেই। ফলে ওরা পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ায় নি।
—ও হোঃ, ভেরী স্যাড্। সন্তানই যার নেই, তার তো কিছুই নেই। আক্ষেপ করে ওঠেন আই. এস. টির প্রেসিডেন্ট রবার্ট।
—কে বলল সন্তান নেই ? আছে, একটি রোবো ছেলে ও রোবো মেয়ে। ঐ দেখুন, ওরা রোবোনার পাশেই বসে আছে। ছেলেমেয়ে দুজনেই হায়ার স্টাডি করেছে। এখন দুজনে আমার রোবো সংস্থায় কাজ করছে। ফলে কি হচ্ছে দেখুন। রোবোনা—সৌরিন বিবাহিত জীবনের আনন্দ ভোগ করছে। সন্তানদের সুখী সান্নিধ্য পেয়েছে, পাচ্ছে। যেদিন রোবোনা সৌরিন মারা যাবে, সেদিন ঐ দুই রোবো সন্তানদের লাইফও শেষ হবে। সেভাবেই ঐ দুই রোবোটকে সিনক্রোনাইজড করা আছে। এমনি করেই বিবাহিত মানুষী পুরুষ নারীরা যদি সন্তান উৎপাদন না করে শুধু রোবো-সন্তানদের গ্রহণ করেন, তাহলে পৃথিবীর মানুষী জনসংখ্যা আর বাড়বে না। বরং ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। তবে একটা কথা, অপ্রয়োজনীয় মানুষদের, অসৎ মানুষদের, আমার এই পন্থায় বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না। আমার এই নিউ রোবোটিক সিবর্গ মেথডে বাঁচিয়ে রাখুন শুধু সৎ, জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, প্রয়োজনীয় মানুষদের যেমনি করে আমি বাঁচিয়েছি শ্রদ্ধেয় স্জাটিস্ সুবর্ণ চক্রবর্তীকে, রূপান্তরিত করেছি মানুষ সিবর্গম্যানে। এই পন্থা অবলম্বনে দেখবেন ২২০০ সালে আপনাদের পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৫০০ কোটি থেকে নেমে যাবে ৬০০ কোটিতে। আর সেই পৃথিবীতে থাকবে জ্ঞানী মানুষ, সৎ মানুষ, হৃদয়বান মানুষ। এমনিভাবেই দুশতাব্দী জন্ম নিয়ন্ত্রণ করলে পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য আনা যাবে। তারপর না হয় আবার নিয়ন্ত্রিতভাবে মানুষী সন্তানদের জন্ম দিন। জনচাপে তখন পৃথিবী আর ভারাক্রান্ত হবে না। দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে নিশ্চুপ হয় বাওরুণ জোয়ারদার।
—মিস্টার বাওরুণ, আপনার এই মতবাদ মানা যাচ্ছে না। পুত্র সন্তানরাই বাবা মায়ের বংশধারাকে বহন করে। রোবো-সন্তান গ্রহণ করলে সেই বংশধারা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে সমাজে বংশজ গৌরব বলতে কি আর থাকবে ? শ্যামকিশোর ঘোষ বলে ওঠেন।
—না বন্ধু, আপনার চিন্তাধারায় কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। পুত্র-কন্যা, আত্মজদের মধ্যে দিয়ে বংশানুক্রমে বংশগৌরব প্রবাহিত হয়, একথা ঠিক। কিন্তু পুত্র-কন্যারা যদি গৌরবময় কাজ করে, তবেই তো তা সম্ভব হবে। কিন্তু এটা না হয়ে যদি ক্লেদাক্ত অন্যায় কাজে বংশধররা নিজেদের জড়িয়ে ফেলে, তাহলে সেই

সব বংশধররা বংশকে কালিমাময়ই করবে। তাকান এই পৃথিবীর বিপুল জনসমষ্টির দিকে। এদের কতজনের পরিবারের গৌরবগাথা আমরা জানি? কজন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ, কজন গান্ধী—জিন্না, কজন আব্রাহাম লিঙ্কন, সান-ইয়াৎ সেন, লেলিন, মার্কিন লুথার? পৃথিবী যখন সত্যিকার মহৎ-সৎ-জ্ঞানী লোকে ভরে উঠবে, তখনই তো আবার ফিরে আসবে গৌরবময় পৃথিবী। দুশতককে মনে করুন না কেন অবাঞ্ছিত মানুষ বাছাই-এর বছর। অবান্তর মনে হলেও কাজটা অসম্ভব নয়। আসুন না জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এই নবতম পরীক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষা করি। দীর্ঘ বক্তব্য ধীরে ধীরে ব্যক্ত করে বাওরুণ জোয়ারদার।

ওয়ারলড্ টি· ভি সেণ্টার ঘোষণা করে—বন্ধুগণ, আপনারা আজ যেসব রোমহর্ষক ঘটনা দেখলেন, কাহিনী শুনলেন, তার জন্য পৃথিবীর জনসমষ্টির পক্ষ থেকে আমরা বাওরুণ জোয়ারদারকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন রাত ৯টা। শুভরাত্রি।

টি· ভি প্রোগ্রাম শেষ হয়। নামে নিথরতা রোবো হাউসে।

পনেরো দিন শেষ হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ উন্মুখ খবরটা জানবার জন্য। পৃথিবীর জনতার রায়ে জানা যাবে যন্ত্রমানব বিজ্ঞানী বাওরুণ জোয়ারদার, না মানুষ বিজ্ঞানী রবার্ট ফিনগল্যাণ্ডস্, ইণ্টারন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজীর প্রেসিডেণ্ট হবার যোগ্য।

রাত ৯টা বাজল। ভারতীয় টি· ভি· সেণ্টারের খবর চালু হোল। ঘোষিকা বললেন—আজকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর, আই· এস· টির সভাপতি পদের জনতার রায়ের ফলাফল। পৃথিবীর ১৫০০ কোটি মানুষের মধ্যে ১১২০ কোটি কোটি মানুষ আই· এস· টির সভাপতি হিসাবে চেয়েছেন বাওরুণ জোয়ারদারকে। জনতার মতে, যে বিজ্ঞান সাধক দেশ ও দশের হিতকর কার্জ করছেন নিজে বিন্দুমাত্র তার এল ভোগ না করে তিনি সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি। এই পৃথিবীর বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্রের। তারা তাই চেয়েছেন বাওরুণ জোয়ারদারকে, যিনি এক শতাব্দী ধরে মানুষকে বহু কিছু দিয়েছেন, বহু লাঞ্ছনা যন্ত্রণা অপমান সহ্য করেও। তারা আরও বলেছেন, বাওরুণ জোয়ারদারকে অনানারী ডক্টরেট পদবীতে ভূষিত করা হোক।

ঘোষক আরও বললেন—জনতা যদিও জানে, এই নির্বাচন শুধুমাত্র এক সমীক্ষা, তবুও তাঁরা এই মুহূর্তেই ররার্ট ফিগনল্যাণ্ডে পদত্যাগ দাবি করেছেন ও বলেছেন তিনি যেন ডক্টর বাওরুণ জোয়ারদারকে সভাপতি পদে বরণ করে জনতার মতামতকে মর্যাদা দেন।

টি· ভি· ক্যামেরায় ফুটে ওঠে রোবো হাউসে রিসার্চে মগ্ন ধ্যানতাপস ডক্টর

বাওর্ণ জোয়ারদারের ছবি। বাওর্ণের মুখে চঞ্চলতা নেই। পদলোভী মানুষের প্রাপ্তিলাভের উল্লাসতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠল ডক্টর রবার্ট ফিগনল্যাণ্ডসের মুখটা। উত্তেজনা, রাগ, অপমানে সে মুখ ক্ষিপ্ত শার্দূলের মত।

এই চাঞ্চল্যকর সংবাদে একদল মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে স্বার্থান্বেষী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র, উকিল-ব্যারিস্টার। আর এর আছে অর্থগৃধ্নু বহু ব্যবসায়ীরা আর ফন্দীবাজ কিছু রাজনৈতিক নেতারা।

স্বার্থই যদি না থাকে, অর্থের পাহাড়ই যদি না জমে, ক্ষমতাই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে এইসব স্বার্থলিপ্সু, অর্থগৃধ্নু, ক্ষমতালোভীরা থাকবে কি করে?

গোপন মিটিং শুরু হয়। তারা ভাবে, কে জানে, একদিন এই রোবোট বাওর্ণ জোয়ারদার তাদেরও ধুলোয় ছুঁড়ে দেবে কিনা? শুরু হয় ষড়যন্ত্র, তারা স্থির করে ধ্বংস করো রোবো হাউসকে, রোবো-নগরীকে, রোবো জেনারেল রোবোট বাওর্ণকে।

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হোতে থাকে। মাস তিনেক কাটবার পরে সহসা একদিন টি. ভি. প্রোগ্রাম চালু হোতেই, ঘোষিকা ঘোষণা করেন —বন্ধুগণ, আজ আমাদের পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী যেসব অনুষ্ঠান ছিল তা বাতিল করা হোল। আমরা রোবো বিজ্ঞানী, ডক্টর বাওর্ণ জোয়ারদারের সবিশেষ অনুরোধে এখন থেকে কয়েক ঘন্টাব্যাপী তাঁর সর্বশেষ কাজের কিছু নমুনা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। ডক্টর বাওর্ণ জোয়ারদারই তাঁর কাজের বিবরণ ব্যাখ্যা করবেন। ওভার টু রোবো-হাউস, ডক্টর বাওর্ণ জোয়ারদার স্পিকিং।

টি. ভি পর্দায় ভেসে ওঠে রোবো হাউসের ড্রইংরুম। ড্রইংরুমে বসে রোবো-ম্যান বাওর্ণ জোয়ারদার!

—বন্ধুগণ, আপনাদের সামনে এর আগে যতবারই এসেছি ততবারই আপনারা আমায় সাদর স্নেহ প্রীতি ভালবাসা জানিয়েছেন। সেই ভরসায় আপনাদের কাছে এসেছি। আমার একান্ত গোপনীয় কিছু তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য। আপনারা জানেন, গত দীর্ঘ একশ বছরে আমি, আমার রোবো-বন্ধুরা আপনাদের সব কাজে বহুভাবে সাহায্য করেছি। তার প্রতিদানে মানুষী সমাজ কি দিচ্ছে দেখুন। আমার এই ছবি মানুষ-যন্ত্রের সম্পর্কের কথা বলবে। ছবিটা দেখুন। টিভির পর্দায় ফুটে উঠে ছবি।

জনতা একের পর এক বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। একি! রাজনৈতিক কিছু ক্রেতা কিছু ব্যবসায়ী, কিছু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, বিজ্ঞানী—সমাজ-

বিরোধীরা একি করছে ? রোবো হাউসের চারপাশে বিছিয়েছে মাইন, যাতে মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলতে পারে রোবো-হাউস, তার ল্যাবোরেটরি, রোবোদের কটেজগুলোকে।
ওকি ! রোবো নগরীর চারপাশে ওরা ও কি করছে ? মাই গড। সব ভেঙ্গে চুড়ে তছনছ করবার ব্যবস্থা করছে যে ? ওরা কারা ?
—বন্ধুগণ, ঘণ্টাখানেকে ধরে যা দেখছেন তা গত কয়েকমাসে যা ঘটেছে তারই সত্যিকার ছবি। ক্ষমতার লোভে, অর্থের লোভে, স্বার্থের লোভে, দেশকে, জাতিকে, বিজ্ঞানীকে ধ্বংস করছে কিছু মানুষেরাই। এই সব মানুষের হাতেই রাষ্ট্রভার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করছে। দেশের হাতেই মানুষের জীবন-সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব এই সব স্বার্থান্বেষীদের। কিন্তু মানুষ জানেনা আমাদের রোবোটিক ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে সব ঘটনাই মুহূর্তে আমাদের নজরে এসেছে। আমরা জাষ্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তীর বিচারে নিজ স্বার্থ রক্ষার অধিকার পেয়েছি। তাই সেই অধিকার বলে প্রশ্ন করছি ? এদের হাতে দেশ রাষ্ট্র সমাজ কি আজ বিপন্ন নয় ? বলুন, এরপর আমি কি আমার এই বিরাট রোবোট বাহিনী নিয়ে শুধু নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি ?
বন্ধুগণ, আপনাদের রায় চাই। আপনাদের আদেশ হলে, পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব আমি আমার রোবো বন্ধুদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। আর সে ক্ষেত্রে, পৃথিবীর প্রথম শাসক, হোন জ্ঞানী মানুষ, সিবর্গ মানুষ জাষ্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তী। সাতদিনের মধ্যে রোবো-হাউসে আপনাদের মতামত পাঠান। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পৃথিবীর বিপর্যয় অনিবার্য।
টি. ভি প্রোগ্রাম শেষ হয়।

অষ্টম দিনে ডক্টর বাওরুণ জোয়ারদারের ছবি আবার ফুটে উঠল টিভিতে।
—বন্ধুগণ, জনতার রায় আমার হাতে।.১৫০০ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪৮২-কোটি মানুষ জানিয়েছেন, দেশকে-জাতিকে-পৃথিবীকে বাঁচান। আপনি জাস্টিস সুবর্ণ চক্রবর্তীর সাথে পৃথিবীর শাসনভার তুলে নিন।
বন্ধুগণ, আজ তাই এসেছি শ্রদ্ধেয় মানুষ, সিবর্গ মানুষ, সুবর্ণ চক্রবর্তীকে নিয়ে। প্রাজ্ঞ সুবর্ণ চক্রবর্তী, আপনি পৃথিবীর পালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করুন। বিনিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে সিবর্গ মানুষ সুবর্ণ চক্রবর্তীর দুহাত চেপে ধরে ডক্টর বাওরুণ জোয়ারদার।
মানুষ সুবর্ণ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ান। বলেন—রোবোট জগতের বিস্ময়, বিজ্ঞান-জগতের অপূর্ব নিদর্শন, ডক্টর বাওরুন জোয়ারদার, পৃথিবীকে বাঁচাবার তোমার এই প্রচেষ্টা সত্যিই ধন্যবাদর্হ। তুমি যে মানুষের মত লোভী নও,

স্বার্থান্বেষী নও, অর্থলিপ্সু নও তারই প্রমাণ, পৃথিবীকে বাঁচাবার সর্ববিধ গুরুদায়িত্ব তুমি কাঁধে নিচ্ছ, কিন্তু পৃথিবীর শাসকের গৌরবময় পদে বৃত করছ আমাকে। এখানেই পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে রোবোট মানুষদের তফাত। রোবোটা, মানুষদের সুখী করতে চায়, এটাই প্রমাণ করছ তুমি।

সলাজ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ডক্টর বাওরুণ জোয়ারদার! নির্লোভী ব্যক্তির চেহারা যে কত সুন্দর, অপরূপ, তারই ছবি বাওরুণের চোখে মুখে।

—কিন্তু ডক্টর বাওরুণ, পৃথিবীর সব মানুষই যে লোভী নয়, স্বার্থপর নয়, প্রমাণ আমাদেরই রাখতে হবে। তাই যে গৌরবময় পদমর্যাদায় উপহার তুমি আমায় দিলে, তা আমি গ্রহণ করে তোমাকেই তা অর্পণ করলাম। তুমিই হও পৃথিবীর প্রথম পালক। আমি মানুষ হয়েও সানন্দচিত্তে থাকব তোমারই পাশে, তোমারই সহকর্মী আজ্ঞাবহ হয়ে। অন্তত রোবোট জগত এটুকু জানুক পৃথিবীর বুক থেকে ভালবাসা, মহত্ত্ব, নির্লোভী, সততা, আজ ২১ শতকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বন্ধু ডক্টর বাওরুণ, সমস্ত পৃথিবীর প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে নিজেকে বৃত করে, আমাকে, পৃথিবীর মানুষ্যবাসীকে ধন্য কর।

আবেগে সিবর্গ সুবর্ণ চক্রবর্তী দুহাতে জড়িয়ে ধরে রোবো মানুষ ডক্টর বাওরুণ জোয়ারদারকে। সুখীদের আনন্দে বাওরুণের চোখে নামে জল। রোবোটও তাহলে কাঁদে!

———